চার পুণ্যস্থান

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ।

প্রকাশক—
রেভাঃ ভিক্ষু এন্ জিনরতন
মহাবোধি সোসাইটী
৪এ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বা ধর্ম্মপাল রোড, সারনাথ।

রাখী পূর্ণিমা, শ্রাবণ, ১৩৫২

মূল্য ৸০, বাঁধান ১৲

প্রিণ্টার—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য।
দি নিউ প্রেস
১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ,

রায় বাহাদুর, মহাশয়ের করকমলে।

মুখবন্ধ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত উপাদেয় এবং তথ্যপূর্ণ "ভারতের দেব দেউল" গ্রন্থের লেখক, আজীবন সাহিত্যসেবী ও তীর্থপর্য্যটক মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আবার তাঁহার সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় "চার পুণ্যস্থান" বইখানি বাংলার সহৃদয় পাঠক পাঠিকার নিকট উপস্থিত করিলেন। ধর্মপ্রাণ অনাগারিক ধর্মপাল স্থাপিত স্থানীয় মহাবোধি সোসাইটীর অর্থে ও সৌজন্যে বইখানি যে ভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে উহা যেমন একদিকে বৌদ্ধ যাত্রিগণের পক্ষে তেমন অপর দিকে সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে উপযোগী হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার গৌরব অথবা স্পর্দ্ধা ঘোষ মহাশয়ের নাই, অথচ বইখানি পড়িলে সহজে বুঝিতে পারা যায় এ জাতীয় গবেষণার প্রতি তাঁহার দরদ এবং অনাবিল আন্তরিক শ্রদ্ধা কত সুগভীর। সব চেয়ে যাহা ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে তাহা হইতেছে লেখকের প্রাণের গভীর সহানুভূতি, স্বভাব সুলভ শ্রদ্ধা এবং অহৈতুকী ভক্তি ভগবান বুদ্ধের প্রতি, তাঁহার অহিংস মৈত্রী করুণাপূর্ণ এবং নির্বাণমুক্তি-প্রদায়িনী অমূল্য বাণীর প্রতি। চারপুণ্যস্থানের প্রত্যেক বস্তুর সহিত, প্রতি দর্শনীয়, স্মরণীয়

ও মননযোগ্য প্রাচীন ও আধুনিক কার্য্যের সহিত তাঁহার অন্তরের যোগাযোগ। এই অপূর্বভাবটি তাঁহার প্রতি ছত্রে জ্যোৎস্নাকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহার এই পুস্তিকায় সুদূর চীন হইতে মধ্য এশিয়ার মরুবীথি অনুসরণ-কারী বৌদ্ধ পর্য্যটকগণের তীর্থযাত্রা এবং উঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে ভারতের লুপ্ত, ভূপ্রোথিত এবং বিস্মৃত বৌদ্ধ তীর্থস্থান আবিষ্কর্ত্তা জেনারেল কানিংহাম সাহেবের প্রাত্নতাত্ত্বিক সাফল্য প্রোদ্ভাসিত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণনার উদার আলোকে অমর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার কবি ও লেখকগণের রচনাগুলিও প্রসঙ্গক্রমে পাঠকের দৃষ্টিপথে ধরা হইয়াছে ভগবান বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রতি, শ্রদ্ধা ভক্তি সঞ্চার বর্দ্ধনের জন্য।

অনাগারিক ধর্মপালের সময় হইতে মহাবোধি সোসাইটীর সকল মহৎ প্রচেষ্টা ও কার্য্যের সহিত ঘোষ মহাশয়ের প্রাণের কতটা নিবিড় সংযোগ তাহা তাঁহার লেখনীতে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই সংযোগ আজ পর্য্যন্ত অটুট আছে।

এ ভাবেই আমি বইখানি পড়িয়াছি এবং পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি, -ঐতিহাসিক গবেষকের দৃষ্টিতে নহে, সমালোচকের কঠিন কষ্টিপাথর প্রয়োগ করিয়াও নহে।

বর্ণিত চার পুণ্যস্থান হইতেছে প্রথম লুম্বিনী যাহা বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান, দ্বিতীয় বুদ্ধগয়া যাহা বোধিসত্ত্বের সিদ্ধিস্থান, তৃতীয় সারনাথ যাহা ধর্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থান

এবং চতুর্থ কুশীনগর যাহা বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির স্থান। যে দৃষ্টিতে আমি স্থান চতুষ্টয় দেখি তাহাতে প্রত্যেকটীই এক অভূতপূর্ব জন্মস্থান, যথা—লুম্বিনী বোধি-সত্ত্বের, বুদ্ধগয়া বুদ্ধত্বের, সারনাথ বৌদ্ধধর্মের এবং কুশীনগর বৌদ্ধ স্তূপ-স্থাপত্যের। লেখক দেখাইয়াছেন ভগবান বুদ্ধই স্বয়ং চার পুণ্যস্থানের মাহাত্ম্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধালু কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয় এবং ধর্মের অনুপ্রেরণা লাভের স্থান বলিয়া। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মহাপরিনির্বাণোন্মুখ তথাগতের এবম্বিধ উক্তিতেই বৌদ্ধগণের চারি মহাপুণ্যস্থানের নির্দেশ এবং ঐ সকল স্থান দর্শনের জন্য তীর্থ পর্য্যটনের সূচনা। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্যগণ যাঁহারা শাক্য নামে এ দেশের সাহিত্যে ও অনুশাসনগুলিতে ধন্য হইয়াছেন তাহারা শাক্যসিংহের জন্মস্থান শাক্যরাজ্য কপিলবাস্তুকে সগৌরবে 'জাতিভূমি' অর্থাৎ জন্মভূমি বলিয়া মনে করিতেন। তথাপি দেখা যায় বিশ্বের সর্বপ্রধান ধর্ম বিজয়ী ও বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠাতা মৌর্য্য সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের পূর্বে উক্ত স্থানগুলি তীর্থে পরিণত হয় নাই এবং নানা দেশাগত ভক্ত বৌদ্ধগণও যথারীতি তীর্থ গমন আরম্ভ করেন নাই। কাওয়েল ও নীল সম্পাদিত দিব্যাবদান গ্রন্থের (পৃঃ ৩৮৯) মতে সম্রাট অশোক নিজেই পূর্বে বৌদ্ধাচার্য স্থবির উপগুপ্তের নিকট তীর্থযাত্রার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন এই মর্মে "অয়ং মে মনোরথো যে ভগবতা

বুদ্ধেন প্রদেশা অধ্যুষিতাস্তান্ দর্শেয়ং চিহ্নানি চ কুর্য্যাং পশ্চিমায়াং জনতায়াং অনুগ্রহার্থম্।"

"ইহাই আমার মনের অভিপ্রায় যে, যে সকল স্থানে ভগবান বুদ্ধের দ্বারা অধ্যুষিত তাহা দর্শন ও চিহ্নিত করা পরবর্ত্তী জনগণের উপকারের জন্য।" এই মহদুদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার মানসেই তিনি স্থবির উপগুপ্তকে পুরোবর্ত্তী করিয়া লুম্বিনী আদি বুদ্ধ অধ্যুষিত প্রধান প্রধান স্থানগুলি দর্শন ও চিহ্নিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসন সমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁহার রাজ্যাভিষেকের ১০ম বর্ষে, কলিঙ্গ বিজয়ের অন্যূন বৎসর কাল পরে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের অব্যবহিত পরেই, সম্বোধিতে অর্থাৎ বুদ্ধগয়ায় গিয়াছিলেন, এবং ইহাই তাঁহার পক্ষে হইয়াছিল প্রথম ধর্ম্মযাত্রা মৃগয়াদি বিহারযাত্রার পরিবর্ত্তে। কিন্তু তিনি যথা-রীতি ধর্ম্মযাত্রা বা বৌদ্ধতীর্থযাত্রা আরম্ভ করেন অভিষেকের ঊনবিংশতিতম বর্ষ হইতে। বিংশতিতম বর্ষে তিনি ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান বলিয়া সুপরিচিত লুম্বিনী গ্রামে গমন করিয়া ঐ স্থানের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন এবং যথাবিধি শিলাশোধনের পর এক শিলাস্তম্ভ উত্তোলন করেন। সেই হইতেই মৌর্য্য শিল্পের উন্নত নিদর্শন শিলাস্তম্ভই তাঁহার পক্ষে বৌদ্ধদিগের পবিত্র স্থানগুলি চিহ্নিত করিবার উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। কাজেই ঐতিহাসিকের পক্ষে অনুমান করিতে বাধা থাকিতে পারে না যে, যেখানে যেখানে তিনি

শিলাস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন ঐ ঐ স্থান বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত বুদ্ধ অধ্যুষিত স্থান। চিহ্ন অর্থে স্তম্ভ শিরোপরি স্থাপিত সেই সেই স্থানের বৈশিষ্ট্যসূচক স্মারক চিহ্নও গ্রহণ করা বলে, যেমন সারনাথ (ঋষিপত্তন মৃগদাব) চিহ্নিত করিবার পক্ষে সুদৃশ্য শিলানির্মিত চক্র। অবশ্য এই শেষোক্ত পদ্ধতি সকল স্থানে অবলম্বিত হইতে পারিয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। তবে চারি মহাস্থান দর্শন বিষয়ে বুদ্ধের নির্দেশই যে ধর্মাশোকের ধর্মযাত্রার পেছনে অনুপ্রেরণার কারণ ছিল তাহা তাঁহার লুম্বিনী স্তম্ভ অনুশাসনের বয়ান হইতেই স্বতঃ প্রমাণিত হয়। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"দেবানপিয়েন পিয়দসিন লাজিন বীসতিবসাভিসিতেন অতন অগাচ মহীয়িতে 'হিদ বুধে জাতে সক্যমুনী'তি ইত্যাদি।"

"এখানে শাক্যমুনি জন্মিয়াছে" এইজন্য দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী নিজে আসিয়া (ইহাকে) মহত্ত্ব দান করিয়াছেন।"

মজ্ঝিম নিকায়ের ১ম খণ্ডের অন্তর্গত বত্থূপম সুত্তের উক্তি হইতে সপ্রমাণ করা যায় যে, বুদ্ধের সময়ে এবং পূর্বে বাহুদা, অধিকক্কা, গয়া, প্রয়াগা, বাহুমতী, সরস্বতী ও সুন্দরিকা প্রভৃতি নদী হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং বহুস্থান হইতে লোকেরা আসিয়া পাপ-মল বিধৌত করিবার জন্য স্নান করিত এবং অষ্টকার সময় পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিত। মহাভারতের

তীর্থযাত্রাপর্বের বর্ণনা হইতেও স্পষ্ট দেখা যায় যে, যে সকল নদী ও নির্ঝরের জল স্নানের পক্ষে প্রশস্ত ছিল, যে সকল স্থান ঋষি অধ্যুষিত ছিল এবং যে সকল স্থানে অত্যাশ্চর্য্য কিছু ছিল তাহাই তীর্থরূপে খ্যাত হইয়াছিল।—এই পুরাতন হিন্দু তীর্থযাত্রার মূলে ছিল কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার। যদিও কার্য্যতঃ তীর্থদর্শন করিতে যাইয়া যাত্রিগণের পক্ষে দেশপর্য্যটন, বহু জাতি-বিজাতি ও গুণীজ্ঞানীর সাক্ষাৎ লাভ ইত্যাদি ঘটিত। প্রিয়দর্শী অশোক ধর্মযাত্রার ব্যবস্থা করিতে যাইয়া হিন্দু তীর্থযাত্রার আনুষঙ্গিক সদুদ্দেশ্যগুলিই পরিস্ফুট করিতে গিয়াছিলেন যদিও পরে বৌদ্ধ তীর্থপর্য্যটকগণের মধ্যে বোধিদ্রুম, বুদ্ধমূর্ত্তি, বুদ্ধব্যবহৃত পাত্র-চীবরাদি বিষয়ে অদ্ভুত পরিকল্পনা ও বহু অলৌকিক অন্ধ বিশ্বাসের অভাব দৃষ্ট হয় নাই। কুসংস্কার ছায়ার ন্যায় অমর, যতই আঘাত কর না কেন লাঠি ভেঙে যায়, কিন্তু মরিয়াও মরে না, মরিলেও পুনরায় একভাবে না একভাবে আত্মপ্রকাশ করে সকল ধর্মের ইতিহাসে যতই না কেন তাহা উচ্চাঙ্গের হউক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের হরপ্পা (হরাপ্পা), মহেন্‌জোদারো (মহেন্দ্রদ্বার) প্রভৃতি সিন্ধু তটবর্তী নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল স্থাপত্য, দেবদেবীর বিগ্রহ এবং যোগীমূর্তির জাজ্বল্যমান নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়াছে উহাদের অবিচ্ছিন্ন ধারা এখনও বাহির হয় নাই সত্য। তথাপি একথা দৃঢ়তার সহিত বলা চলে যে,

বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন চৈত্য এবং মনুষ্যাবয়বে দেবদেবীর প্রতিকৃতি (বিগ্রহ ও চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তি) ছিল এবং জনসাধারণ উহাদের যথাবিধি পূজা করিত (পাণিনি, ৫।২।৯৬—১০০)। পালি প্রামাণিত গ্রন্থ বিনয় পিটকভুক্ত সুত্তবিভঙ্গ হইতেও প্রমাণিত হয় যে, দেবদেবীর দারুমূর্তি (দারুধিতলিকা) এবং আলেখ্য প্রতিকৃতি (লেপচিত্ত) পূজার বস্তুরূপে দেশে সুপ্রচলিত ছিল। অতএব বৌদ্ধধর্ম হইতে যে হিন্দুদিগের মূর্তিপূজা বা পৌত্তলিকতার উদ্ভব হয় নাই ইহা অবধারিত সত্য। সুখের বিষয় এই যে ঘোষ মহাশয় বৌদ্ধধর্মের পক্ষে গ্লানিকর কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতে যান নাই।

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ছাপা ও কাগজ সম্বন্ধে গ্রন্থকার অথবা প্রকাশকগণের পছন্দসই কিছু করিবার শক্তি নাই। এ সময়ে যাহা পাওয়া যায় তাহাই সাদরে গ্রহণীয়।

আমি আশা করি যে উদ্দেশ্যে এবং যাহাদের জন্য বইখানি লেখা হইয়াছে তাহাতে ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে এবং সাধারণ পাঠক ও পাঠিকারও যথেষ্ট উপকার হইবে। ইতি—

কলিকাতা,
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫২

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া।
পালি অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বুদ্ধের জন্মস্থানের স্তম্ভ—

বুদ্ধের জন্ম লুম্বিনীতে

মূলগন্ধকুটীর প্রাচীরচিত্র

চার পুণ্যস্থান

লুম্বিনী

লুম্বিনী জগতের এক পরম পুণ্যস্থান। যে ভারত করুণাময় বুদ্ধদেবের লীলা নিকেতন, তাহারই শিরোদেশে বিরাজিত চিরতুষারমণ্ডিত মহাস্থবির হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবাস্তু নগর অবস্থিত। একদা কপিলবাস্তু পরম ঐশ্বর্য্যশালী জনবহুল সুন্দর নগর ছিল। তাহারই উপকণ্ঠে শাক্য রাজা শুদ্ধোদনের প্রিয় প্রমোদ কানন অবস্থিত। আজ হইতে ২৫৬৭ বৎসর পূর্ব্বে পুণ্য বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকৃতির শোভাময় ক্রোড়ে লুম্বিনীর এক শাল বৃক্ষতলে গৌতম বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে করুণাময় মহামানব মানবের জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর তাপ হইতে নর-নারীকে মুক্তি পাইবার সত্য পথ সন্ধান দিয়াছিলেন. সেই বুদ্ধদেবকে আজও জগতের অর্দ্ধেক নর-নারী ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। কবি গাহিয়াছেন—

"উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার।
আজিও অর্দ্ধ-জগৎ জুড়িয়া ভক্তি প্রণতঃ চরণে তাঁর ॥"

—দ্বিজেন্দ্রলাল

দিব্যাবদান গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে স্থবির উপগুপ্তের মুখে বৌদ্ধদিগের লুম্বিনী প্রমুখ পবিত্র স্থানগুলির নাম জানিতে পারিয়া ধর্ম্মপ্ররায়ণ সম্রাট অশোক নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "আমি এই সকল পুণ্যস্থান দর্শন করিয়া তথায় এমন স্মৃতি চিহ্ন রাখিব যাহাতে ভবিষ্যৎ যাত্রীগণ সহজে তীর্থগুলি নির্ণয় করিতে পারিবেন।" বস্তুত অশোক স্থাপিত শিলা স্তম্ভের পূর্ব্বে লুম্বিনীতে কোন স্মৃতি চিহ্ন ছিল না। অশোকের সময় হইতে সেই ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী দর্শনে কত শত-সহস্র নর-নারী আজও শান্তি পায়। কপিলবাস্তু নগরের ঐশ্বর্য্য চিহ্ন এখন আর নাই। কিন্তু লুম্বিনীর প্রাকৃতিক শোভা এখনও বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করে। বর্ত্তমানে লুম্বিনী স্বাধীন হিন্দু রাজ্য নেপালের অন্তর্গত। নওতানা বৃটিশ সম্রাজ্যের সীমানায় আউধ ও ত্রিহুত রেলের শেষ রেল ষ্টেসন। সেখান হইতে লুম্বিনী প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। যুগে যুগে বহু ভক্ত লুম্বিনীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। বিখ্যাত চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ৪০০-৪১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তিনি লুম্বিনী দর্শন করিতে গিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ফা-হিয়ান লিখিয়াছেন ঃ—"আমরা কপিলবাস্তু নগরে উপস্থিত হইলাম। এই নগরে কোন রাজা ছিল না এবং

কোন লোক তখন বাসও করিত না। এক বিশাল মরুভূমির মতন পড়িয়া আছে। কেবল এক দল বৌদ্ধ শ্রমণ এবং দশঘর সাধরণ লোক বাস করিত। শুদ্ধোদনের রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ যেস্থানে অবস্থিত তথায় একটি চিত্র লক্ষ করিলাম। চিত্রটি রাজ কুমারের মাতৃগর্ভে প্রবেশের একটি দৃশ্য। রাজ কুমার স্বর্গ হইতে শ্বেতহস্তি রূপে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতেছেন।"

"সেই স্থানে যে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। যে স্থানে তিনি রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন ; যে স্থান হইতে গৌতম রথ ঘুরাইয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে স্থানে বসিয়া ঋষি অসিত রাজ-কুমারের ভাগ্য গণনা এবং জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে স্থানে আনন্দ ও অন্যান্য শাক্য রাজ-কুমারগণ এক দুর্দ্দান্ত হস্তিকে মুষ্টির আঘাতে মারিয়াছিলেন, সেই স্থানগুলি চিহ্নিত করিয়া স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।"

শাস্ত্রে আছে একদা কুমার সিদ্ধার্থ তাঁহার বৈমাত্রেয় আনন্দ ও মাতুলপুত্র দেবদত্ত ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যখন নগরে প্রবেশ করেন, তখন নগর তোরণের নিকট একটি মত্তহস্তি দেখিতে পান—আনন্দ এক মুষ্টির আঘাতে সেই হস্তির প্রাণনাশ করেন। মৃত হস্তি দ্বাররুদ্ধ করিয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া দেবদত্ত তাহা হাতে করিয়া তুলিয়া দূরে ছুড়িয়া দেন, তৎপর সিদ্ধার্থ সেই হস্তির মৃতদেহ হাতে

তুলিয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া নগরের বাহিরে ফেলিয়া দেন। যেখানে হস্তির মৃতদেহ পতিত হয় সে স্থানটি গর্ত্তে পরিণত হইয়া ছিল। তাহাই "হস্তিগর্ত্ত" নামে খ্যাত।

"'হস্তিগর্ত্তে'র উপর এক স্তূপ নির্ম্মিত হয়। এখান হইতে ৩০ লী দক্ষিণে রাজ-কুমার সিদ্ধার্থ দ্বারা একদা নিক্ষিপ্ত একটি তীর ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া এক প্রস্রবণ সৃষ্টি করিয়াছিল। সেইটি পরবর্ত্তী কালে তীর্থযাত্রীরা জলপানের কূপ রূপে ব্যবহার করিতেন। সেখানেও একটি স্তূপ আছে।"

শিংটু গ্রন্থে লিখিত আছে:—সিদ্ধার্থ পঞ্চদশ বৎসর বয়সে যখন শাক্য রাজকুমারগণের সহিত রণকৌশল শিক্ষা করিতেছিলেন তখন একদা তূণ হইতে তীর লইয়া ধনুকে যোজনা করেন এবং এমন জোরে ছুড়িয়া দেন যে পর পর সাতটি সোনার ডাবা ও সাতটি লোহার চাঁই ভেদ করিয়া মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। সেইখানে এক জলধারা তদবধি বহির্গত হয়। সেই স্থান চিহ্নিত করিয়া যে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাই ফা-হিয়ান দেখিয়াছিলেন।

সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর প্রথম যখন কপিলবাস্তুতে গমন করেন এবং পিতা ও আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলিত হন, তখন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"বুদ্ধদেব রাজপ্রাসাদের বাহিরে থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং সেই অন্নে আহার করিতে-ছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া পিতা শুদ্ধোদন ব্যথা পান এবং

বুদ্ধের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে কাতর স্বরে বলিলেন—'এই কি আমাদের শাক্যকুলপ্রদীপ যুবরাজ সিদ্ধার্থ? তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছ, এ কি কখন সহ্য হয়? হা বৎস! এরূপ কেন হইল?'

বুদ্ধ উত্তর করিলেন—'মহারাজ! আমার কুলধর্ম্ম এই! মহারাজ কহিলেন—'সে কি কথা? কোন বংশে তোমার জন্ম? ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজপুরুষরা কি তোমার পিতৃপুরুষ ছিলেন না? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি কখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ কখন কি সে কথা শুনিয়াছে?' গৌতম কহিলেন—'আমার বংশ রাজবংশ নহে, বুদ্ধেরা আমার পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহাদেরই চিরন্তন প্রথা অনুসারে আমি ভিখারী বেশে এই রাজদ্বারে সমাগত হইয়াছি। কিন্তু মহারাজ, আত্মপ্রভাবে এবং প্রেমবলে যে মলিন বসন দীনহীন ভিখারী, মহাপ্রতাপশালী রাজ-রাজেশ্বর অপেক্ষাও আজ তার উচ্চাসন। আমি যে অক্ষয় অমূল্যরত্ন ভেট লইয়া আসিয়াছি তাহা পিতৃদেবের চরণে সমর্পণ করি আমার একান্ত ইচ্ছা, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুণ।' শুদ্ধোদন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পুত্রের হস্ত হইতে ভিক্ষা পাত্র লইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় রাজা, প্রজা, মন্ত্রিবর্গ সভাস্থ সকলকে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। চতুর্মহাসত্য, অষ্টমহামার্গ, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, অহিংসা, অনুকম্পা, মৈত্রী, শাশ্বত শান্তিরূপিণী নির্ব্বাণমুক্তি

এই সকল সত্য অমৃতধারার ন্যায় বর্ষিত হইল। সেই সব উপদেশ শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন প্রীত হইলেন; তাঁহার সকল সংশয় দূর হইল, সকল ক্ষোভ মিটিয়া গেল।

যখন রাজপুত্র প্রাসাদে প্রবেশ করেন তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজ পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই উপস্থিত হইল, কেবল যশোধরা নাই।

বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—'যশোধরা কোথায়?' রাজা বলিলেন—'যশোধরাকে আসিবার জন্য বলা হইয়াছিল কিন্তু তিনি আসেন নাই, বলিয়াছেন—'তথাগত যদি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন তাহা হইলে তিনিই তাঁহার নিকট আসিবেন।'

তিনি আসিবেন না শুনিয়া গৌতম তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখেন, যশোধরা মলিনবেশে রুক্ষ আলুলায়িত কেশে ঘরে বসিয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার চিরসম্বরিত প্রেমাশ্রু উথলিয়া উঠিল। তাঁর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে রাজাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অভাগিনী যশোধরা এতকাল পতিবিরহে গৌতমের কষ্ট সহ্যর কথা শুনিয়া দীনবেশে, অনাহারে, অনিদ্রায়, কষ্টে দিন যাপন করিতেছিলেন সে সব কথা রাজা খুলিয়া বলিলেন। বুদ্ধের মন গলিয়া গেল। তখন তিনি যশোধরা পূর্ব্বজন্মে কিরূপ গুণবতী ছিলেন তাহার এক জাতক গল্প বলিয়া তাহাকে

সান্ত্বনা করিলেন। পরে তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন, বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণে তাঁহার হৃদয় মন আকৃষ্ট হইল ও বৌদ্ধদের মধ্যে সন্ন্যাসিনীশ্রেণী স্থাপিত হইবার পর তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর মধ্যে প্রধানা বলিয়া পরিগণিত হইলেন।"

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বৌদ্ধধর্ম্ম' সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী।৫

পল কেরস সাহেব এই উপাখ্যান বিস্তারিত ভাবে তাঁহার 'গস্‌পেল অব বুদ্ধ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। যশোধরার প্রেম যে বুদ্ধের সাধনার সহায় হইয়াছিল, মারগণের অত্যাচার ও নর্ত্তকীদের প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়াছিল, সে কথা বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন। এ-তথ্যও সেই গ্রন্থে রহিয়াছে। এই মহাসত্যে উদ্বোধিত হইয়া মহিলা কবি বলিলেন—

প্রেমময়ী যশোধরা, মোরা সত্য জানি,
বুদ্ধের জীবনে তুমি নহ উপেক্ষিতা,
সিদ্ধার্থে অটুট প্রেম সত্য বলি মানি,
তোমারে করেন প্রভু অমৃতে দীক্ষিতা।
তপস্যায় তথাগত নিরত যেদিন,
যশোধরা-প্রেম আসি উদিত অন্তরে,
ধ্রুব সে যে, স্থির সে যে, সে যে অমলিন,
পবিত্র আধারে প্রেম গাঁথা স্তরে স্তরে।

বুদ্ধের তপস্যা দূর গহনে গহনে,
পতিব্রতা তপোরতা প্রাসাদের কক্ষে,
নিঃসঙ্গ কাটায় দিন নিস্তব্ধ নির্জ্জনে
আত্মায় প্রেমের ধ্যান দৃষ্টির অলক্ষ্যে।

ধন্য তুমি বুদ্ধপ্রিয়া সতী সিমন্তিনী
বুদ্ধের করুণা জয় করিলে নিশ্চিত ;
ভোগাপ্লুতা নারী নহ তুমি তপস্বিনী
তোমার তপস্যা হেরি জগৎ বিস্মিত।

সারা বিশ্বে মৈত্রী যাঁর লভিল বিস্তার
শুদ্ধ যিনি, বুদ্ধ যিনি, পরম পবিত্র,
যশোধরা-প্রেম-ঋণ করেন স্বীকার,
আশ্চর্য্য করুণা দীপ্ত কী মহান চিত্র !

—শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর।

পিতা-পুত্র-পত্নীর মিলন স্থানে ভক্তগণ যে স্তূপ বা বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন ফা-হিয়ান তাহা দেখিয়াছিলেন। ফা-হিয়ান আরো লিখিয়াছেন—

"যেখানে পাঁচ শত শাক্য বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপালিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন, যে স্থানে ধরিত্রী পর পর ছয় বার কম্পিত হইয়াছিল, যে স্থানে মহা প্রজাবতী (বুদ্ধের মাসি) বুদ্ধকে 'সংঘাটি' দান করিয়াছিলেন, ন্যগ্রোধ দ্রুমতলে যে স্থানে বুদ্ধ পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়া ধ্যান করিতেন, বিরূঢ়ক রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী

শাক্য রাজবংশের পুত্র-পুত্রীকে যে যে স্থানে ধ্বংশ করিয়াছিলেন সেই সব স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এখনও সেই গুলি সব বর্ত্তমান রহিয়াছে।"

বিরূঢ়ক পাঁচশত শাক্য কুমারীকে নিজ অন্তঃপুরোচারিণী করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সে অপমান বরণ করিতে অসম্মত হওয়াতে বিরূঢ়ক রাজা তাঁহাদের নিষ্ঠুরভাবে বিকলাঙ্গ ও হত্যা করিয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেও বুদ্ধের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি অটল ছিল। তাঁহারা সকলেই বুদ্ধের কৃপায় মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

"কয়েক লী উত্তরপূর্ব্বে রাজ উদ্যান; তাহার মধ্যে এক বৃক্ষতলে বসিয়া সিদ্ধার্থ মাঠে খেলা দেখিতেন। নগরের পঞ্চাশ লী পূর্ব্বে লুম্বিনীর রাজ উদ্যান অবস্থিত। এই উদ্যানের পুষ্করিণীতে রাণী (মায়া দেবী) স্নান করিয়া আগমন করিবামাত্র তাহার প্রসব বেদনা উত্থিত হয়। তখন তিনি একটি শাল বৃক্ষের শাখা ধরিয়া দণ্ডায়মান হন। তখনই বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন এবং জন্মমাত্রই সদ্যজাত শিশু সিদ্ধার্থ সপ্তপদ গমন করেন। এই স্থানটি পরে একটি কূপে পরিণত হয় এবং তাহারই পার্শ্বে প্রিয়দর্শী রাজা অশোক একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান।......কপিলবাস্তু রাজ্য এখন এক বিরাট মরুভূমি। রাস্তায় কদাচিত লোক দেখা যায়, হস্তি ও

সিংহ প্রায় বিচরণ করে। বুদ্ধ যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারই পাঁচ যোজন দূরে রামগ্রাম (Lan mo) দেশ অবস্থিত।" এই বর্ণনা ফা-হিয়ান ও সুঙ্গ-ইয়ান এর চীন ভাষায় ভারতবর্ষ ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকে আছে। বিল সাহেব কর্ত্তৃক 'ট্রাভেলস্ অব ইণ্ডিয়া' ফা-হিয়ান এণ্ড সুং-ইয়ন, বুদ্ধিষ্ট-প্রিলগ্রিমস্, চায়না টু ইণ্ডিয়া (৪০০ এ, ডি—৪১৮ এ, ডি) চীন ভাষা হইতে অনুবাদিত ইংরাজী গ্রন্থ।

ফা-হিয়ান কপিলবাস্তু হইতে রামগ্রাম যতদূরে অবস্থিত লিখিয়াছেন হিউয়েনসাং তাহাই বলিয়াছেন। মহাবংশ গ্রন্থে রামগ্রামের অনুরূপ স্থানে অবস্থানের কথা আছে। কিন্তু মহাবংশে রামগ্রামে যে স্তূপের কথা আছে তাহা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে—বস্তুত তাহা নহে, ইহা গণ্ডক নদীরই তীরে।

লুম্বিনী উদ্যানে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান চিহ্নিত করিয়া রাজা অশোক যে স্তম্ভটি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইটী ফা-হিয়ান দেখিয়াছিলেন (৪০০—৪১৮ খৃঃ মধ্যে) এবং চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং ৬২৯ হইতে ১৯ বৎসর ভারত ভ্রমণ করেন, তাহার মধ্যে লুম্বিনী গিয়াছিলেন—বীল সাহেবের ফা-হিয়ানের ভারত ভ্রমণ অনুবাদ গ্রন্থের মুখবন্ধে পৃঃ ৩৪ আছে। তিনি সেই স্তম্ভটি দর্শন করিয়া তাহার বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। আজও সেই অশোক স্তম্ভ সেই স্থানে

অবস্থিত। কালের ও মানবের পীড়নের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সেই শিলা স্তম্ভ বুদ্ধদেবের পবিত্র জন্মস্থান, আজও নির্দ্দেশ করিতেছে। যদিও স্তম্ভটি বজ্রাঘাতে বিধ্বস্ত হইয়াছিল তথাপি তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি এখনও স্পষ্টাক্ষরে পাঠ করা যায়। সেই শিলালিপিতে ব্রহ্মী অক্ষরে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত আছে যাহার ভাবার্থ—"রাজাধিরাজ পিয়দর্শী নিজে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দর্শনে এই স্থানে আসিয়া শ্রদ্ধার্পণ করিয়া ছিলেন।" ইহার ইংরাজী অনুবাদ- "His Mejesty King Piyadarsi having come in person did reverance, because here Buddha was born..." (Beal's life of Houen Tsang.) খৃঃ পূর্ব্ব আড়াই শত বর্ষে সম্রাট অশোক লুম্বিনীতে গমন করিয়াছিলেন। তদাবধি সেই স্থান বুদ্ধের জন্মস্থান রূপে পুজিত হইয়া আসিতেছে।

মানবের হাতে গড়া সকল শিল্প ঐশ্বর্য্য ও স্থাপত্য কালের নির্ম্মম পীড়নে ও মানবের অত্যাচারে ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতি তাহার সাক্ষ্য এখনও বহন করিয়া আসিতেছে। যে ধরণীর বক্ষে গৌতম সিদ্ধার্থ পাদচারণ করিয়াছিলেন, যে জলস্রোত হইতে তথাগত বারি পান করিতেন, যে গভীর বনানীতে তিনি চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিতেন, যে তুষারমণ্ডিত গগণস্পর্শী হিমগিরি তাহার অন্তরে ভাব উদ্বোধিত করিত, যে ধরণীর মানবের

জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর যন্ত্রণা তাঁহার চিত্তে বেদনা দিত এখনও তেমনই সেই সব প্রকাশমান। ভক্তের ভক্তি-শ্রদ্ধায় বুদ্ধের অমৃতবাণী এখনও দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়া পড়ে, এখনও তাঁহার অমর আত্মার অনুভূতি সাধকরা পায়, এখনও তাঁহার প্রবর্ত্তিত সত্যের সন্ধানে মানব প্রবৃত্ত হয়, এখনও বিশ্বের কত নর-নারী পরম শান্তিদায়িনী নির্ব্বাণ লাভের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া ছুটিয়া যায়।

সকল জীবনের মূল যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া ব্রহ্মে কিংবা শূন্যে মিশিয়া যাওয়াই মুক্তি বা নির্ব্বাণ। পরম ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্মের পরষ্পর সম্বন্ধ বিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"বৈদান্তিক চৌতালা মন্দিরের তুরীয় অবস্থা এবং বৌদ্ধ চৌতালা মন্দিরের নির্ব্বাণ মুক্তি এ পিঠ ও পিঠ।" বেদান্ত মতে জীবাত্মার পরব্রহ্মে বিলীন হওয়া—বৌদ্ধ মতে নির্ব্বাণ প্রলয়সাগরে ডুবিয়া যাওয়া একই কথা ইহার ঊর্দ্ধে আর কিছুই নাই—নিস্তব্ধতা, শূন্যতা!

সাংখ্য ও বুদ্ধদর্শন মধ্যে ঐক্য দেখিয়া একই মুলে উৎপত্তি অনেকে বলেন। মধুপুরের কপিল আশ্রমে আচার্য্য হরিহরানন্দ সাংখ্যাচার্য্য মহাশয় সে দিন বলিলেন সাংখ্যের 'কৈবল্য' ও বুদ্ধের 'নির্ব্বাণ' যথার্থ একই আদর্শ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুইটী দর্শনের বিশ্লেষণে নির্ব্বাণ সমন্ধে বলিলেন—"ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি উভয়েরই লক্ষ্য কিন্তু সে

লক্ষ্য কিসে সিদ্ধ হয়? কপিলমুনি দুইটি মূলতত্ত্ব মানিয়া চলেন, প্রকৃতি আর পুরুষ। সত্ত্ব, রজ, তমো গুণাত্মক প্রকৃতি নর্ত্তকীর ন্যায় পুরুষের সম্মুখে সংসাররূপ মায়ার খেলা খেলিতেছেন, পুরুষ নিজদর্পণে তাহা দর্শন করিতেছেন। প্রকৃতির এই মায়াময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত করিয়া, প্রকৃতির অজ্ঞানচরিত আবরণ জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ফেলিয়া দিয়া পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র রূপে আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তখন সেই মায়ার খেলা থামিয়া যায়; তখনি তিনি দুঃখক্লেশ জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করেন।

বুদ্ধের রাজ্যে পুরুষের অস্তিত্ব নাই। তিনিও বলেন সকলি অনিত্য—সকলি ক্ষয়শীল—সকলি দুঃখময়; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল নাম রূপের মূলে সত্য বস্তু কিছুই নাই। বুদ্ধের গম্যস্থান নির্ব্বান—বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞানও নহে—সাংখের আত্মতত্বও নহে—কিন্তু নির্ব্বাণ, যার মূলার্থ নিবিয়া যাওয়া—অন্য কথায়, জীবাত্মার অস্তিত্ব লোপ।"—বৌদ্ধধর্ম্ম পৃঃ ১৫।

সেই নির্ব্বাণের পথপ্রদর্শক গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান দর্শন করা পরম পুণ্য; গোরক্ষপুর হইতে ৬০ মাইল উত্তরে আউধ ও ত্রিহুত রেলের শেষ রেলষ্টেশন নওতানা—সেখানে হইতে নামিয়া লুম্বিনী যাইতে হয় ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গোযানে বা পদব্রজে। নওতানে লুম্বিনী যাত্রীদের বিশ্রাম করিবার জন্য একটি পান্থশালা অবস্থিত। বৌদ্ধাচার্য্য মহাস্থবির সিরিনিবাস নিজের অর্থে এই সুদৃশ্য পান্থশালাটি

নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে (১৯৪৫ সালে) লুম্বিনীর মঠাধ্যক্ষ। লুম্বিনীতে অশোক স্তম্ভের নিকটই একটি প্রাচীন বিহার আছে, তাহার মধ্যে একটি চিত্রে বুদ্ধদেবের জন্ম কথা চিত্রিত আছে। মায়া দেবী সোজা হইয়া একটি শাল গাছের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর তাঁরই পার্শ্বে শিশু বুদ্ধ দণ্ডায়মান। লুম্বিনীতে নেপাল রাজ একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন—সেই মন্দিরে নিত্য শিব আদি হিন্দুদের দেবদেবীর সহিত বুদ্ধমূর্ত্তি পুজিত হয়। নেপাল সরকারের একটি ভাল যাত্রী-নিবাসও আছে। এখনও লুম্বিনীতে বুদ্ধভক্তরা শ্রদ্ধার সহিত বলেন—

ওঁ মণি পদ্মে হুম্

মূলগন্ধ-কুটী বিহার, সারনাথ

বুদ্ধগয়া

বুদ্ধদেবের জীবন কথায় ও বৌদ্ধধর্ম্মে গয়া পরম পুণ্য স্থান রূপে চির আদৃত ও পুজিত। নানা শাস্ত্র ও পুস্তকে বুদ্ধগয়ার ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। গৌতম বুদ্ধের সাধনার ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির স্থানরূপে বুদ্ধগয়া সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত। পুণ্যস্থান রূপে বৌদ্ধ জ্ঞানীদের নিকট পূজিত।

ফা-হিয়ান ৪১৫ খৃষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি গয়া দর্শন করিয়া যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই পুণ্যভূমিতে বুদ্ধদেবের লীলার স্থান গুলির উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই সব স্থানে যে সব স্তূপ, বেড়া, সঙ্ঘরাম দেখিয়াছিলেন তাহারও বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। বীল সাহেবের ফা-হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থের—৩১ অধ্যায় বর্ণনা এইরূপ আছে।

"পশ্চিমদিকে ৪ যোজন গমনের পর আমরা গয়ানগরে উপস্থিত হইলাম। এখানেও নগরটি জনশূন্য ও পরিত্যক্ত। দক্ষিণে ২০ 'লী' যাইয়া যে স্থানে বোধিসত্ব ছয় বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন সেই স্থানে আমরা উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটি এখন জঙ্গলাকীর্ণ। এই স্থানের ৩ লী পশ্চিমে আমরা উপস্থিত হইলাম, যেখানে বুদ্ধ স্নান করিবার জন্য নদীতে নামিতেন এবং তাঁহার উঠিয়া আসিবার সহায়তা

করিবার নিমিত্ত দেবতাগণ গাছের ডাল আগাইয়া ধরিতেন। (এই স্থানটি মহাবংশে ১৬৮ মঃ 'সুপ্রতিস্থিতা' নামে উল্লিখিত হইয়াছে এবং নদীটি নৈরঞ্জনা নামে খ্যাত—বর্ত্তমানে নিলাজন।)

পুনরায় উত্তরে তুই লী যাইয়া আমরা যে স্থানে গ্রাম্য বালিকারা বুদ্ধকে পায়স প্রদান করিয়াছিলেন সেখানে উপস্থিত হই।"

কিংবদন্তী আছে যে বুদ্ধদেব ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করিবার পরও যখন পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন তিনি কৃচ্ছ সাধনে কিঞ্চিৎ বিরত হইলেন। তখন উরুবিল্ব গ্রামের প্রধানের কন্যা সুজাতা দাসী সঙ্গে লইয়া তুগ্ধ ও ভাত মিশ্রিত পরমান্ন প্রদান করেন এবং বুদ্ধদেব তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

"এখান হইতে ২ লী উত্তরে এক বৃক্ষতলে যে স্থানে বুদ্ধদেব পাষাণের উপর বসিয়া পূর্বদিকেচক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া তুগ্ধ ও অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন সেই স্থান অবস্থিত। আজও সেই বৃক্ষ ও প্রস্তর সেই স্থানেই অবস্থিত। পাথরটি প্রায় ছয় ফুট চৌকা এবং তুই ফুট উচ্চ। মধ্যভারতে জলবায়ু এমনই সমতা বিশিষ্ট নাতীশিতষ্ণু যে এই স্থানে গাছ হাজার হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকে। এই স্থান হইতে অর্দ্ধ যোজন দূরে একটি কুটীর মধ্যে প্রস্তর উপর বোধিসত্ব যোগাসনে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। এই

বুদ্ধগয়ার মন্দির

ধর্মরাজিকা বিহার—কলিকাতা

রূপ ধ্যানস্থ থাকিয়া তিনি চিত্ত অন্তর্মুখী করিতেন এবং ভাবিতেন যে—"আমাকে যদি প্রকৃত সত্য জ্ঞান পাইতে হয় তাহা হইলে কোন অলৌকীক অবস্থা উপলদ্ধি করিতে হইবে।" তৎক্ষণাৎ সেই গুহার দেয়ালে বুদ্ধ নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। সে ছায়াটি তিন ফুট উচ্চ। এখনও সেই ছায়া পরিস্কার দেখা যায়।

তখন ত্রিভুবন হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল এবং দেবতারা চিৎকার করিয়া বলিলেন—"বুদ্ধত্ব লাভের এ স্থান নহে, এখান হইতে দক্ষিণ পশ্চিম অর্দ্ধযোজন পরে যে বটবৃক্ষ আছে তাহাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সাধনার স্থান।" এই উক্তির পর দেবতারা গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং পথ দেখাইয়া চলিলেন। বুদ্ধদেবও গাত্র উত্থান করিয়া দেবতাদের অনুসরণ করিলেন। ত্রিশ হাত দূরে গিয়া দেবতারা তাঁহাকে একখানি কুশাসন প্রদান করিলেন। আসনটি গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধ আরো ২৫ হাত অগ্রসর হইলেন। তখন দেবতারা তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

বোধিসত্ব তখন বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া সেই কুশাসন বিছাইলেন এবং পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া ধ্যানে রত হইলেন, তখন মার রাজা তিনটী অপূর্ব্ব চিত্তহরণকারিনী সুন্দরী যুবতীকে গৌতম বুদ্ধর মন আকর্ষণ করিবার জন্য উত্তর দিক হইতে পাঠাইলেন। (ইহাদের নাম তৃষ্ণা, রতি, রঙ্গ)।

মার নিজে দক্ষিণ দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। তখন বোধিসত্ব পায়ের গোড়ালী পৃথিবীর উপর আঘাত করা মাত্র মারগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং যুবতীত্রয় হরিণীর রূপ পাইয়া দৌড়াইয়া পালাইল।

পূর্ব্ব উল্লিখিত স্থানগুলির উপর পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধদেবের ভক্তগণ নানা প্রকার স্তূপ ও মূর্ত্তি (বুদ্ধের) স্থাপনা করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এখনও সেই সব সৌধ ও মূর্ত্তি অটুট আছে।

নানা গ্রন্থে আছে—"বাল্যকাল হইতে সিদ্ধার্থের সংসারে প্রতি বিতরাগ ছিল। পরে মনে পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় নিত্যপদার্থের অন্বেষণে সংসার ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহার নবকুমারের জন্ম আর একটী মায়াবন্ধন বাড়িল ভাবিয়া সিদ্ধার্থ ব্যাকুল হইলেন। পুত্র জন্মিবার সপ্তম দিবসীয় রজনীতে সিদ্ধার্থ ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে পূর্ণ যৌবনে নিত্যপদার্থের অন্বেষণে অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিলেন। ইনি প্রথমতঃ বৈশালী নগরে অড়ার পণ্ডিতের নিকট কিছুকাল হিন্দুশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলেন। তৎপরে রাজগৃহে (বর্ত্তমান রাজগীরএ) গমন করিয়া এক গিরিগুহায় রুদ্রক নামক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তথা হইতে উরুবিল্ল গ্রামে গমন করিয়া তৎসন্নিহিত উপবনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় পাঁচজন সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত

মিলিত হইয়া শিষ্যভাবে তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর সিদ্ধার্থ গয়াধামের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া অতি কঠোর তপস্যায় রত হইয়া ছয় বৎসরকাল একই স্থানে অতিবাহিত করিলেন। সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধ হইলেন। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইল। তিনি আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। চিত্ত চাঞ্চলের সহিত কামনার নির্ব্বাণ হইল। কামনার সহিত ইন্দ্রিয়-প্রভাবের নির্ব্বাণ হইল, সুখের নির্ব্বাণ হইল, দুঃখের নির্ব্বাণ হইল। সিদ্ধার্থ সিদ্ধ হইয়া বুদ্ধ হইলেন অর্থাৎ পরম জ্ঞানী হইলেন।

বুদ্ধদেব স্বয়ং মুক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন না, কিরূপে অপরকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন, তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি এক নূতন ধর্ম্মের পথের সন্ধান পাইলেন। তিনি উপদেশ দিলেন—আত্মোৎকর্ষ সাধনই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে দয়াবৃত্তির পরিচালনা আবশ্যক। সদ্দৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সদ্‌বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকাহরণ, সচ্চেষ্টা, সংস্মৃতি, সম্যক্ সমাধি—এই অষ্টবিধ উপায়ে মানব মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। বুদ্ধের ধর্ম্মে জাতি বিচার তিরোহিত হইল। ধর্ম্মপথে উন্নতির ন্যূনাধিক্য বশতঃ ব্যক্তিগত বিভিন্নতা দৃশ্যমান হইলেও জাতিগত বিভিন্নতার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর নবধর্ম্মে পরিবর্জ্জিত হইল।

অতি নীচজাতিয় শূদ্রও নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এবং সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করিয়া সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে।"

এই মহাসত্য গয়াতে বুদ্ধ প্রাপ্ত হন। সেই গয়াতে ফা-হিয়ান গিয়াছিলেন।

ফা-হিয়ান লিখিয়াছেন, "বুদ্ধদেব চরম জ্ঞান লাভ করিবার পর সপ্তদিবস নির্ম্মল আনন্দে-মগ্ন ছিলেন। যে স্থানে তিনি এইরূপ প্রেমানন্দে অবস্থান করিয়াছিলেন সেই স্থানে ভক্ত, রাজা ও প্রজাগণ স্তূপ, বিহার ও সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার প্রতি লীলাস্থান চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন। যেমন—

(১) যে রত্নচংক্রমে (ফা-হিয়ানের মতে বটবৃক্ষতলে) সাতদিন বুদ্ধদেব পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পাদচারণ করিয়া ছিলেন। (২) যে স্থানে দেবতারা বুদ্ধের পূজা করিয়াছিলেন। (৩) যে স্থানে নাগরাজ মুচলিন্দ (সং-মুচকুন্দ) বুদ্ধদেবের দেহ বারিবর্ষণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (৪) যে বটবৃক্ষ তলে ব্রহ্মা জনসাধরণের মধ্যে বুদ্ধকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন এবং চারি লোকপাল বুদ্ধকে ভিক্ষা পাত্র দান করিয়াছিলেন। (৫) যে স্থানে পাঁচ শত বণিক তথগতকে 'লাজ' ও মধু দান করিয়াছিলেন। (৫) যে স্থানে কাশ্যপ প্রমুখ জটীল দিগকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সেই সব স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আবার যেখানে গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন সেখানে

তিনটি সঙ্ঘরাম অবস্থিত ছিল। সেখানে বহু শ্রমণ ও ভিক্ষু বাস করিতেছিল। তাঁহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা স্থানীয় দাতাগণ যথাযথভাবে করিতেন এবং তাঁহারাও বিনয়ের নিয়মগুলি ঠিকমত পালন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেন।" (ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থ হইতে)

ফা-হিয়ান বর্ণিত বুদ্ধগয়ার স্তূপ বা বিহারের কোন চিহ্ন এখন নাই। বর্ত্তমানে বুদ্ধগয়াতে যে বড় মন্দির দেখা যায় তাহার কোন উল্লেখ ফা-হিয়ান করিয়া যান নাই। অশোক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহারও কোন চিহ্ন এখন পাওয়া যায় না।

সম্রাট অশোক অন্যূন ২৬৮ পূর্ব্ব খৃঃ হইতে ২৩০ পূঃ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ৮৪,০০০ হাজার স্তূপ, বিহার, স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধর মহিমা ও বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কবি সেই জন্য সগর্ব্বে গাহিয়াছেন—

"অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হ'তে
জলধি শেষ"

বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির স্থান গয়া, প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন স্থান সারনাথ, পরিনির্ব্বাণ লাভের স্থান কুশীনগর এবং তাঁহার অস্থি যে অষ্ট স্থানে (রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, আল্লকল্প, রামগ্রাম, বেষ্টদ্বীপ, পাবা ও কুশীনগর) সংরক্ষিত হইয়াছিল সেই সমস্ত স্থানে অশোক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফা-হিয়ান ও হিউয়েন সাং অশোকের

স্থাপিত স্তূপ ও বিহার দেখিয়াছিলেন। হিউয়েন সাং ৬২৯ খৃঃ অব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং বুদ্ধগয়াতে গিয়াছিলেন। তিনি বোধিদ্রুমের বিহারের বড় মন্দিরের ও অন্যান্য সৌধের এবং প্রত্যেকটি বুদ্ধমুর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন। বোধিবৃক্ষের ঠিক পূর্ব্বে ৫০ ফুট সমচতুষ্কোণ গ্রেনাইট পাথরের পোস্তার উপর, ১৭০ ফুট উচ্চ যে বিহার বা মন্দির হিউয়েন সাং দেখিয়া ছিলেন তাহাই বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার প্রধান মন্দির। ঠিক কবে যে মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কোন সঠিক প্রমাণ নাই। তবে ফা-হিয়ানের আগমনের পর আর হিউয়েন সাং এর ভারত ভ্রমণের অগ্রে কোন এক সময় অর্থাৎ ৪০০ খৃঃ—৬২৯ খৃঃ মধ্যে এই বিরাট সৌধটি নির্ম্মিত হইয়াছিল—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

হিউয়েন সাং এর বর্ণনায় আছে—এই মন্দিরের শিরোদেশে বৃহৎ উজ্জ্বল তাম্রের উপর স্বর্ণজল মণ্ডিত কলস স্থাপিত ছিল, নীলবর্ণের টালির দ্বারা এই মন্দিরের বহির্দেশ আচ্ছাদিত, তাহার উপর চুণের পলাস্তারার আবরণ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বিভিন্ন তলায় বহু কুলঙ্গীতে বুদ্ধের সুবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। "A Towering Pile of blue tiles covered with chunum having many niches in the different stories filled with golden figures of Budha" (Beal's life of Hieun Tsiang)

জেনারেল কানিংহ্যাম আর্কিয়লজিক্যাল রিপোর্ট, ১৮৬১-

৬২ পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান মন্দির আকারে ও মাপে হিউয়েন সাং বর্ণিত মন্দিরের অনুরূপ। এখন মন্দিরটি ১১২ ফুট উচু এবং ৫০ ফুটের কিছু কম চতুস্কোণ গ্রেনাইট পাথর দ্বারা নির্ম্মিত পোস্তার উপর অবস্থিত। গাঢ় লাল ইটের নির্ম্মিত সৌধটির উপর নীল আভাযুক্ত টালির দ্বারা আবৃত। পূর্ব্বে সমগ্র গাত্রে চূণের পলস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ৮ সারিতে থাকে থাকে ক্রমশঃ সরু হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। বাহিরের দেয়ালে বহু কুলঙ্গী সারিতে সারিতে আছে। অনেকগুলিতে এখনও বুদ্ধমূর্ত্তি বসান আছে। মূর্ত্তিগুলি ইষ্টক ও পলস্তারা দ্বারা নির্ম্মিত এবং সম্ভব সুবর্ণ রংএ রঞ্জিত ছিল।" (স্বাধীন ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন রাজানুগ্রহে সু-প্রতিষ্ঠিত তখন এই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিগুলি সুবর্ণ ধাতুতে নির্ম্মিত হইয়া বিরাজ করিত। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সে ঐশ্বর্য্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।)

হিউয়েন সাং এর মতে এই স্থানেই সম্রাট অশোক ২৫৯-২৪১ পূঃ খৃঃ মধ্যে একটি বিহার মির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার পর এক ব্রাহ্মণ মহাদেব দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই স্থানে এক বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

মন্দিরের ভিতর পূর্ব্বে যোগাসনে বসা এক বিরাট বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। মূর্ত্তিটী উচু ১১′-৫″, হাটু হইতে হাঁটু পর্য্যন্তর মাপ ৮′-৮″, এবং কাঁধ হইতে কাঁধ পর্য্যন্তর মাপ ৬′-১″।

সে মূর্ত্তিটী বহুদিন হইল অন্তর্ধান হইয়াছে। কিন্তু তাহার পাদপীঠ ঠিক সেই স্থানেই আছে। ইহার মাপ ১৩´-২´´+৫´-৮´´×৪´-১´´; এই মাপ হিউয়েন সাং প্রদত্ত মাপেরই মতন (Julican's; Hieun Tsiang, II, P. 456 লিখিত বিবরণের অনুবাদ।)

৯৪৮ খৃঃ উৎকীর্ণ একটি প্রস্তর ফলক গয়াতে পাওয়া যায়, স্যার চার্লস উইলকীনস্ তাহা অনুবাদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে (Bengal Asiatic Research, Vol. I.) এই মন্দির ও বুদ্ধমূর্ত্তি অমরদেবের দ্বারা নির্ম্মিত।

কিন্তু এই শিলালিপির মূল দেখিতে না পাওয়ায় ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। হিউয়েন সাং লিখিয়াছেন যে হিন্দুর দেবতা মহাদেবের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া জনৈক ব্রাহ্মণ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ফা হিয়ান লিখিয়াছেন—একটি শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া বুদ্ধদেব তপস্যা করিতেন এবং তাহারই উপর বসিয়া বুদ্ধ সুজাতার নিকট হইতে পরমান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শিলাখণ্ড ফা-হিয়ান দেখিয়াছিলেন। তাহার মাপ ছয় ফুট লম্বা, দুই ফুট উচ্চ। বর্ত্তমান ভোগেশ্বরীর মন্দিরের মধ্যে একখানি বৃত্তাকারে পাথর আছে। তাহার পরিধি পাঁচ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি এবং দুই ফুট উচু। ফা-হিয়ান বর্ণিত পাথরেরই অনুরূপ।

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে ক্যানিংহ্যাম স্থির করিয়াছেন যে—৪০০ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির ছিল না, ৫০০ খৃষ্টাব্দ নাগাইৎ অমর সিং এই বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কারণ হিউ-য়েন-সাং ৬২৯—৬৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গয়াতে আসিয়া এই মন্দির দেখিয়াছিলেন এবং তাহার বিস্তৃত বিবরণও লিখিয়াছেন। (আর্ক-রিঃ-১৮৬২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫)

ডক্টর বেণী মাধব বড়ুয়া তাঁহার "গয়া এণ্ড বুদ্ধগয়া" ইংরাজী গ্রন্থের ১ম খণ্ডে লিখিয়াছেন—"মগধাধিপ রাজা ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের ধর্ম্মপ্রাণা রাণী কুরঙ্গি রাজা ব্রহ্মমিত্রের পত্নী নাগদেবী ও অপর কায়েকজন দাত্রীর প্রদত্ত অর্থে বোধি-দ্রুমের সম্মুখে এক চতুরস্র উন্মুক্ত চৈত্যের মধ্যে একটি চতু-স্কোণ বেদী, উহাকে বেষ্টন করিয়া চতুষ্কোণ শিলা প্রাকার, তাহার উত্তর পার্শ্বেই সংলগ্ন একচংক্রম চৈত্য নির্ম্মিত হইয়া-ছিল। ফা-হিয়ানের বুদ্ধগয়াতে আগমনের পর এবং হিউ-য়েন-সাং এর গয়া দর্শনের পূর্ব্বে শিব মহেশ্বরের স্বপ্নাদেশ ক্রমে জনৈক ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আকারের বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পুষ্করণীটি খনন করাইয়া দেন। প্রায় সেই সময় মগধাধিপ রাজা পূর্ণবর্ম্মণ ওই মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া বর্ত্তমান বৃহত্তর আকারের শিলা প্রাকারটি স্থাপন করেন।" (লেখকের ভারতের-দেব-দেউল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃঃ ১০২)

সপ্তম শতাব্দী হইতে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস পাইবার সহিত দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত গয়ার মন্দিরের বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। প্রথম সংস্কারের কথা অবগত হওয়া যায় ১১০৫ খৃষ্টাব্দে। এ সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র লিখিয়াছেন, "মন্দিরটি ধ্বংসোন্মুখ হওয়াতে ১১০৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশবাসীদের দ্বারা মন্দিরের আমূল সংস্কার হইয়াছিল। পুনরায় ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে মন্দির নূতন করিয়া মেরামত ও পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল। (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বুদ্ধগয়া' পৃঃ ২০৯)

বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সংস্কার সম্বন্ধে ডক্টর বড়ুয়া তাঁহার "গয়া ও বুদ্ধগয়া" পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন— "পাগানের রাজা চ্যান্‌জিত্থই (১০৮৪—১১১২ খৃঃ) উত্তর ব্রহ্মে প্রথম রাজা যিনি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন। বুদ্ধগয়াতে প্রাপ্ত শিলা লিপি দ্বারা সহজে অনুমিত হয় যে তাহার সেই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা অলংসিথুর (১১১২—১১৬৭ খৃঃ) রাজত্ব কালে আরাকান রাজ লিত্থমিনান্ অলংসিথুর সাহায্যে হৃত রাজ্য ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার নির্দ্দেশে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা তিলোমিনলো তাঁহার রাজধানী পাগান সহরে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুকরণে এক নূতন পেগোডা নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর

শেষ ভাগে পেগুর স্বনামধন্য রাজা ধর্ম্মজেদি দক্ষিণ ব্রহ্মবাসী-দের একটি দলকে (মিশন) উত্তর ভারতে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের ও বোধিদ্রুমের নক্সা আনিবার জন্য পাঠান।

আলোম্প্রা রাজবংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা 'বোধপয়' ১৮১০ খৃঃ এইরূপ আর একটি মিশন ভারতে পাঠান। যাহার ফলে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পুনরায় সংস্কার হয়। সেই সংস্কার কার্য্যে গোপাল ও ধর্ম্মসিং নামে দুইজন রাজমিস্ত্রি নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের দুইজনের নাম মন্দির গাত্র হইতে প্রাপ্ত দুই খণ্ড ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ আছে। সম্ভবতঃ তাহারা দুইজনেই বাঙ্গালী।"

কানিংহ্যাম এক খণ্ড ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় উৎকীর্ণ শিলা-লিপির কথা আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে মন্দিরটি প্রথমে রাজা অশোক দ্বারা স্থাপিত হয়, যেমন হিউয়েন-সাং বলিয়া গিয়াছেন। সেই মন্দির জীর্ণ হওয়াতে নায়ক মোহান্ত নামে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা পুনঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার পর আবার ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়াতে ব্রহ্মদেশের রাজা মন্দিরটি পুনরায় সংস্কার করেন। আবার ১৩০৫ খৃঃ অব্দে জনৈক ব্রহ্মদেশবাসী মন্দিরটী সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করেন ও ১৩০৬ খৃঃ অব্দে সংস্কার কার্য্য শেষ হয়। সেই শিলাখণ্ডে দুইটী ব্রহ্মদেশের সালের নাম উৎকীর্ণ আছে যথা ৬৬০ ও ৬৬৭। এই সালদ্বয় খৃষ্টীয় ১২৯৮ ও ১৩০৬ সালের সমসাময়িক।

মন্দিরটি ১৮৮০—৮১ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহামের তত্ত্বাবধানে ইংরাজ সরকার তুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সম্পূর্ণ সংস্কার করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বেও মন্দিরটি এখনকার মতনই সোজা রেখার ছাঁচে, চার কোণা পিরামিড্ আকারে এক বিশিষ্ট পরিকল্পনায় নয়তলা ছিল। ইহার সংস্কার দ্বারা ভারতের এক বিশিষ্ট স্থাপত্যধারার নিদর্শন রক্ষা পাইয়াছে।

মৌর্য্য কাল হইতে বৌদ্ধ স্থাপত্য প্রধানত পাঁচটি ধারায় নির্ম্মিত হইত, যথা—স্তম্ভ, স্তূপ, চৈত্য, বিহার ও প্রাকার। কিন্তু বুদ্ধগয়ার মন্দির সত্যই এক নূতন পরিকল্পনা।

সংস্কার সময়ে এই বিরাট মন্দির ও তাহার প্রাঙ্গণ যেরূপ ছিল তাহার পরিচয় কানিংহ্যাম দিয়াছেন। তাঁহার সময় মূল মন্দিরের সম্মুখে একটি খোলা মন্দির ছিল, সেই মন্দির এখনও আছে। এই মন্দিরের মধ্যে গোলাকায় এক খণ্ড পাথরের উপর তুইটী পদচিহ্ন খোদাই আছে। সেই মন্দির 'বুদ্ধপাদ' মন্দির নামে খ্যাত।

মন্দিরের সন্নিকটে একটি 'সমাধ' বা চাঁদনী আছে, এই সৌধটি জনৈক মোহান্তের সমাধি স্থানের উপর নির্ম্মিত। এই খানে ৩৩টি অপরূপ কারুকার্য্যে পূর্ণ বেড়া (রেলিং) ধ্বংস অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। কানিংহ্যাম লিখিয়াছেন যে, প্রস্তরের উপর এমন সুন্দর কারুকার্য্য জগতে বিরল। এই সব রেলিং বৌদ্ধ শিল্পীদের প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ কারুকার্য্যের নিদর্শন।

এই বেড়ার প্রস্তর গুলি গ্রেনাইট (ধুসর বর্ণের) পাথরের। সেই সব বেড়ার কয়েক অংশ মোহান্তের আবাসেও আছে। এই সব বেড়ার স্তম্ভ ও টানা রেলিং এর উপর অনেক দাতার নাম উৎকীর্ণ আছে। প্রাচীন বেড়ার বিভিন্ন অংশে রাজা ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের ভার্য্যা আর্য্যা কুরঙ্গীর দানের কথা অশোকের সময়ের ভাষা ও অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে! কতগুলি কারুকার্য্য অতিশয় চিত্তাকর্ষক ; তাহাদের উপর গাছ, স্তূপ, মন্দির, সৌধ, তোরণ নগর প্রাচীরের পরিকল্পনা সূক্ষ্ম ও সুন্দর রূপে চিত্রিত আছে। সেই সময়কার নর-নারীর বেশ-ভূষা, রাজা-রাণীদের পরিচ্ছদ, ইত্যাদি এই সমস্ত খোদাই কার্য্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতে শিল্প ঐশ্বর্য্য, স্থাপত্য কৌশল বৌদ্ধ শিল্পসাধকদের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ যুগেই ভারতের প্রস্তর ও মৃৎ শিল্প ও প্রাচীর-চিত্র চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ভারুৎ, অজন্তা, ইলোরা, সাঁচী, বাঘ, উদয়গিরি, বুদ্ধগয়ার শিল্পঐশ্বর্য্য বিশ্বের শিল্প রাজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশ বিদেশে শত শত শিল্পানুরাগিগণ যুগে যুগে এই সমস্ত শিল্পীদের দক্ষতার প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন, এই সব কারুকার্য্য পরিকল্পনা, স্থাপত্য কৌশল যেমন বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক যুগের শিল্পী ও স্থপতিগণকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে তেমনই যুগে যুগে কত শত সহস্র শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমানে বিশাল মন্দিরের প্রাঙ্গণ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৩১ ফুট

এবং উত্তর-দক্ষিণে ৯৬ ফুট ; পূর্ব্বে এই মন্দির ও বোধি-দ্রুমটি পাথরের বেড়া দ্বারা ঘেরা ছিল। কানিংহ্যাম সাহেব সেই বেড়ার রেলিং ও খুটি কতগুলি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণের পার্শ্বে একটি চাঁদনীর মধ্যে রাখিয়া দেন। মন্দিরের মধ্য ভাগে নয় তলার পিরামিড আকারের গগণস্পর্শী চূড়া উঠিযাছে। উচু পাথরের পোস্তার উপর ইষ্টক দ্বারা মন্দিরটি গঠিত হইয়াছে। দ্বিতলের চাতালের চারি কোণে মধ্য চূড়ার অনুকরণে চারিটি ক্ষুদ্রাকারের মন্দির বিরাজিত। তাহাদের প্রত্যেকটীতে বিভিন্ন পরিকল্পনার মূর্ত্তি স্থাপিত। মধ্যের মন্দিরের দ্বিতলে একটি বড় যোগাসনে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধের প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। নীচের মূর্ত্তি অপেক্ষা উপর তলার বুদ্ধমূর্ত্তিটি মনোরম, প্রশান্ত ভাবোদ্দীপক! ভারতের বৌদ্ধ শিল্পীরা মূর্ত্তি গঠনে সুদক্ষ, পবিত্র ও জীবন্ত ভাব বাটলির আঁচড়ে প্রস্তরের মূর্ত্তিতে ফুটিয়া তুলিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বুদ্ধদেব ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন, তাঁহার ধর্ম্মে পৌত্তলিকতার আভাষও তিনি দেন নাই। তথাপি বৌদ্ধ সাধকরা, বৌদ্ধ শিল্পীরা লক্ষ লক্ষ বুদ্ধ মূর্ত্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী সমগ্র এশিয়া ভূমিতে গঠন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন —"এদিকে আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধেরা নিরীশ্বর এবং দেবপ্রসাদ হইতে পরাঙ্মুখ—ওদিকে দেখি যে, বৌদ্ধেরা

মনুষ্যপূজা এবং মূর্ত্তিপূজার আদি গুরু। এমন কি বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের পরের শতাব্দী হইতেই ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত শত শত স্থান শত সহস্র দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিকীর্ণ হয়; তার সাক্ষী তক্ষশীলা, ইলোরা, অজন্টা, মথুরা, বুদ্ধগয়া। যেমন বুদ্ধগয়ায় তারা দেবী ও বাগীশ্বরী দেবী; বৈশালীতে ধ্যানী বুদ্ধ, অমিতাভ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর; নালন্দবিহারে অবলোকিতেশ্বর, তারা, ত্রিশিরা, ব্রজবরাহী, বাগীশ্বরী, ইত্যাদি।" (বৌদ্ধ ধর্ম্ম, পৃঃ ১৯)

তিনি ইহার কারণ দেখাইয়াছেন—"মানব প্রকৃতির উচ্ছেদকারী—মনুষ্য সমাজের উন্নতির প্রতিরোধী কোন ধর্ম্ম-প্রণালী কালে নিশ্চয়ই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। বাসনাবিরহিত মনুষ্যে মিলিয়া মনুষ্য সমাজ গঠিত হয় না। ঈশ্বরবিহীন ধর্ম্ম অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। মনুষ্য আপনা অপেক্ষা উচ্চতর দৈবশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে অক্ষম।" বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্মে মনুষ্য পূজা নাই, আছে কেবল আদর্শ পূজা এবং মুর্ত্তি পূজাও ভারতে বহু প্রাচীন।

মন্দিরের পূর্ব্বে তারা দেবী ও ভোগেশ্বরীর মন্দির ছিল। হিউয়েন-সাং মন্দির ও মূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পবিত্রতা ও সনাতন সত্য পালন যখন বৌদ্ধদের মধ্যে হইতে কমিয়া আসিতেছিল তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে তন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই তারা দেবী তখন হইতে

বুদ্ধদেবের সহিত পূজা পাইয়া আসিতে থাকে। এই খানে আর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় একটি পুরুষ মূর্ত্তি আছে, তাহার বাম হস্তে পদ্ম, ডান দিকে উত্থিত করে তরবারী এবং দুই পার্শ্বে দুইটী স্তূপ খোদিত আছে। অহিংসা ধর্ম্ম সাধনার সহিত এইরূপ শক্তির আরাধনা যেমন বিস্ময়কর তেমনই অপূর্ব্ব।

প্রধান মন্দিরের প্রথম্ দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া প্রধান প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে উচু প্রস্তরের বেদীর উপর ভূমিস্পর্শ মুদ্রার বিরাটবুদ্ধমূর্ত্তি বিরাজিত। রাজোচিত পরিচ্ছদে গাত্র আচ্ছাদিত। তথাপি নয়নদ্বয় ধ্যানীর মতন সরল ও শান্ত। প্রশস্ত ললাটে কিন্তু চন্দনের বিষ্ণুতিলক শোভিত, গলায় পুষ্পমাল্য বিলম্বিত। বর্ত্তমানে শত সহস্র হিন্দু নর-নারীর নিকট হইতে বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রীদের সঙ্গে পূজা ও অর্ঘ এই বুদ্ধ মূর্ত্তি পাইতেছেন। পরম বৈষ্ণব কবি জয়দেব দশ অবতার স্তোত্রে গাহিয়াছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতম্॥
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর,—জয় জগদীশ হরে॥

করুণা-অবতার বুদ্ধদেবের সাধনার স্থান দর্শন ও ভ্রমণ করিলে প্রাণে অপার আনন্দ হয়, হৃদয়ে পরম শান্তি পাওয়া যায়। বুদ্ধগয়ার মন্দির ও প্রাঙ্গণটি ভারত সরকার পরিচ্ছন্ন

ও সংস্কার অবস্থায় রাখিয়া বিশেষ উপকার করিতেছেন। এখানকার প্রাচীন শিল্পঐশ্বর্য্য সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত শিল্প সম্ভারগুলি দর্শকদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, পুলক ও বিস্ময়ে মন-প্রাণ ভরিয়া তোলে।

মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব্বে একটি পুষ্করিণী এখনও আছে। এই পুষ্করিণী হিউয়েন সাং বর্ণিত মুচলিন্দ (মুচকুন্দ) হ্রদেরই অনুরূপ ; বর্ত্তমানে হ্রদটি 'বুদ্ধতলাও' নামে অভিহিত হয়।

বোধিদ্রুমটি বৌদ্ধদের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। এই বোধিদ্রুম তলেই গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তিনি সাধন বলে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই তিনি মানবের কল্যাণে বিশ্বে দিয়া গিয়াছেন। অহিংসা, দান, সংযম, পরোপকার দ্বারা মানব ইহজগতের দারিদ্র, দুঃখ, ক্লেশ, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। পুনর্জ্জন্মর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া পরম নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে। এখনও সেই মহাতরুর বংশধর বিরাজিত।

এই বোধিদ্রুম হইতে একটি শাখা ছেদন করিয়া সম্রাট অশোক তাঁহার প্রিয় কন্যা ভিক্ষুণী শ্রেষ্ঠা সঙ্ঘমিত্রাকে তৎসহ সিংহলে পাঠান। সেই বৃক্ষের শাখাটি সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অনুরাধপুরে রোপিত হওয়া মাত্রই নানা শাখায় বর্দ্ধিত হয়। আজও সেই বৃক্ষ অনুরাধপুরের বিরাট বিহারে আছে। এই অপূর্ব্ব ঘটনায় মুগ্ধ হইয়া সিংহলের রাজ পরিবারের সকলেই সঙ্ঘমিত্রা ও তাঁহার ভ্রাতা মহেন্দ্রের

নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সঙ্ঘমিত্রার সিংহল যাত্রা এবং সিংহলে তাঁহার আগমন কাহিনী মহাবংস নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত আছে।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে আচার্য্য অনাগারিক ধর্ম্মপাল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মহাবোধি সোসাইটি স্থাপন করিয়া ভারতে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সিংহলের অনুরাধপুর বিহার হইতে সেই অশ্বত্থবৃক্ষের একটি শাখা তিনি কর্ত্তন করিয়া আনিয়া সারনাথে নবনির্ম্মিত মূলগন্ধকুটি বিহারের পূর্ব্বের প্রাঙ্গণে রোপন করিয়াছিলেন। সেই বৃক্ষ শাখা এক্ষণে তরুর আকার ধারণ করিয়াছে।

মন্দিরের উত্তর দিকে বোধিদ্রুমের সংলগ্ন ভূমি হইতে চারি ফুট উচু পঞ্চাশ ফুট লম্বা প্রস্তরে বাধান একটি চত্বর বা চাতাল আছে। সেই স্থানে বুদ্ধদেব চরম সত্য লাভ করিবার পর বিমল আনন্দে সাত দিন অনবরত পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পাদ-চারণ করিয়াছিলেন: এই স্থানের একাংশে কারুকার্য্যময় বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন খোদিত আছে। অতীত কালে এই পদদ্বয়ে বহুমূল্য মণি-মুক্তা ও রত্নরাজি মণ্ডিত ছিল।

এই স্থানের কিছু উত্তরে 'বজ্রাসন' নামে এক খানি প্রস্তরের কারুকার্য্য মণ্ডিত সিংহাসন স্থাপিত আছে। এই আসনের কথা ফা-হিয়ান ও হিউয়েন-সাং উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহারই পশ্চিমে একটি নূতন পাথরের সিংহাসন

দেখা যায়। তাহার গাত্রে "By permission of Behar Govt. and His Holiness Mohanta Joti Bhusan Sri Mohanta Harihar Giri of Buddha Gaya, 1941" উৎকীর্ণ আছে। বুদ্ধ মন্দিরের সন্নিকটেই গয়ার হিন্দু মোহান্তর রাজ প্রাসাদ তুল্য সৌধাবলী। ত্যাগী-যোগী গৌতমের সাধন স্থানে বিরাট জমিদারীর মালিক ও বিপুল ঐশ্বর্য্যপতি মোহান্তর অবস্থান বড়ই বিসদৃশ। এই স্থানে মোহান্তর বিদ্যার্থীভবন অবস্থিত, তাহার গাত্রে এক খণ্ড শিলালিপি প্রোথিত আছে। তাহার উপর উৎকীর্ণ আছে—"আমাদের প্রভু ভগবান বুদ্ধ যে স্থানে তপক্লিষ্ট দেহে দুগ্ধ ও মধু পান করিয়াছিলেন সেই পবিত্র ক্ষেত্রেই সম্রাট অশোক এই বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।" (ষ্টেট রেলওয়ে ম্যাগাজিন, ৮ম খণ্ড)

গয়া সহর ফল্গু নদীর তীরে অবস্থিত। রামশিলা, প্রেতশিলা, ব্রহ্মযোনি আদি পাহাড়ের মধ্যে গয়াধামে বিষ্ণু পাদপদ্মের কষ্টি পাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য মণ্ডিত মন্দির বিরাজিত। গয়াধাম হিন্দুর একটি প্রাচীন পুণ্য তীর্থ। এইখানে পিতৃপুরুষ ও লোকান্তরিত আত্মীয় স্বজনের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান হিন্দুর এক শ্রেষ্ঠ পালনীয় ধর্ম্ম। ই আই রেলপথের গ্রাণ্ডকর্ড লাইনের উপর গয়া একটি বৃহৎ ষ্টেশন। এখানে অনেক বড় বড় ধর্ম্মশালা ও যাত্রীনিবাস আছে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মঠ ও ধর্ম্মশালা বাঙ্গালীর পরম গৌরবের স্থান ও গয়ার তীর্থ করিবার অতি

সুবিধা জনক প্রতিষ্ঠান। এই ধর্ম্মশালায় ৩৫টি কুটীর ১৯৪২ সালে নির্ম্মিত দেখিয়া ছিলাম। ষ্টেশন হইতে আধ মাইল দূরে ম্যাক্‌লিয়ড গঞ্জে মহাবোধি সোসাইটী ১৯২০ খৃঃ "জ্যোতিকা হল" নামে একটি বিশ্রাম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রেলষ্টেশন হইতে ছয় মাইল দূরে যাইলে বুদ্ধগয়া, যাতায়াতের জন্য এক্কা, টম্‌টম্ ও মোটর গাড়ী পাওয়া যায়। বুদ্ধগয়াতে বৌদ্ধদের থাকিবার জন্য একটি যাত্রীনিবাস ১৯২৬ সালে আচার্য্য ধর্ম্মপালএর উদ্যোগে নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯৪৫ সালে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সন্নিকটেই দানবীর শেঠ যুগল কিশোর বিড়লা একটি সুদৃশ্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বিহারে বুদ্ধ ও শিব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

বুদ্ধগয়ার চারিদিকে বুদ্ধমূর্ত্তি ও বুদ্ধের লীলার চিহ্ন বিরাজিত। স্বাধীন ভারতের শিল্পীদের হাতে গড়া ধ্যানী, প্রশান্ত,কমনীয়, তেজোদীপ্ত, সৌম্য বুদ্ধমূর্তিগুলি দেখিলে চিত্ত আনন্দে ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়। এইটি যেন বুদ্ধময় জগৎ, ইহার আকাশ বাতাস এখনও যেন শাক্যসিংহের সিংহনাদে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। নির্জ্জন শান্তিময় স্থানে দণ্ডায়মান হইলেই বিশ্বের পরম পুরুষ করুণাবতার বুদ্ধদেবের স্মরণে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়, বলিতে ইচ্ছা হয়।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ॥
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ॥
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ॥

ড় বুদ্ধগয়া

সংগ্রহালয়—সারনাথ

বোধিদ্রুম—বুদ্ধগয়া

সারনাথ

কাশীক্ষেত্রেরই এক অংশ সারনাথ। কাশী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন দেদীপ্যমান নগর। যে সহর যুগে যুগে পুনঃ পুনঃ বিধ্বস্ত ও গঠিত হইয়া একস্থানেই অবস্থিত। আজও শত সহস্র শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে বারাণসী বিরাজ করিতেছে। গঙ্গার সহিত বরণা ও অসী যে স্থানে মিলিত হইয়াছে সেই সঙ্গম ক্ষেত্রই বারাণসীধাম। সুদূর রামায়ণ-মহাভারতের যুগ হইতে কাশীধাম পরম পুণ্যক্ষেত্র রূপে ভারতবাসীগণের নিকট আদৃত। যখন কাশীধামে বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার, চৈত্য ও স্তম্ভের অপূর্ব্ব শিল্প ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয় নাই তখনও সোনার কাশীর সম্পদের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইত।

শিবপুরাণে, এমন কি অল্‌বারুণীর 'ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, ৪৭ পৃষ্ঠায় কথিত আছে যে—শিব ব্রহ্মার সহিত কলহ করিয়া তাঁহার একটি শির ছেদন করিয়াছিলেন এবং লইয়া যাইবার সময় সেই মস্তকটি কাশীক্ষেত্রে পতিত হয়। তদাবধি কাশীধাম পরম পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। এই স্থানে শিবকে দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্ব বাহিনী গঙ্গা উত্তর বাহিনী হইয়া শিব দর্শন করেন এবং

শিব দর্শনান্তে পুনরায় পূর্ব্ব মুখে সাগরের দিকে ধাবিত হয়। এই স্থানেই গঙ্গা মকরবাহিনীরূপে দেখা দিয়াছিলেন।

বায়ু পুরাণ মতে কাশী মহাদেবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত এবং ভূমিকম্পেও কম্পিত হয় না। বারাণসী বহু পূর্ব হইতে ব্রহ্মদত্ত বংশীয় নৃপতিগণের অতি বিখ্যাত ও সমৃদ্ধশালী রাজধানী এবং বেদবেদাঙ্গাদি হিন্দু শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রধান প্রাচীন কেন্দ্ররূপে খ্যাত।

এই পুরাতন পুণ্য কাশীধামের অদূরে উত্তর প্রান্তে ঋষি-পত্তন নামে এক ভূখণ্ড অবস্থিত। পালি ভাষায় ইহার নাম ইসিপতন; 'পত্তন' মানে নগর, বন্দর। ফা-হিয়ান পত্তন মানে পতন ধরিয়া লইয়াছেন। মহাবস্তু নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বারাণসী হইতে সার্দ্ধ যোজন দূরে এক বন ছিল। সেই বনে পাঁচশত প্রত্যেক বুদ্ধ (সিদ্ধ ঋষি) বাস করিতেন। তাঁহাদের স্বর্গারোহণের সময় যখন নির্ব্বাণলাভ করেন তখন তাঁহাদের দেহ আকাশ হইতে ভূমিতে পতিত হয়। সেই বন মধ্যে ঋষিদের শরীর যে স্থানে পতিত হয়—তাহাই উক্ত কারণে 'ঋষিপত্তন' নামে খ্যাত হয়। 'ঋষিপত্তন' ঋষিদের পবিত্র বাসস্থান। এই ঋষিপত্তনের এক অংশে একটি রাজোদ্যান ছিল—সেখানে মৃগগণ অভয় বর প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত। তাহারই নাম মৃগদাব (পালি মৃগদায়)। আজিও সারনাথ বৌদ্ধতীর্থের অদূরে তিন ক্রোশের মধ্যে এক মৃগো-

স্থান আছে এবং তাহাতে আজিও মৃগগণ স্বচ্ছন্দে বিহার করে। পণ্ডিতদের মধ্যে 'সারনাথ' নামের উৎপত্তির মতভেদ আছে। 'সারঙ্গ' অর্থে এক জাতির হরিণ। আবার 'সারঙ্গ' অর্থে শিবকেও বুঝায়; মহাভারতে 'সারঙ্গ' শব্দে শিবকে বুঝাই-য়াছে। কিন্তু এই মহাভারতে সারঙ্গনাথের উল্লেখ পাওয়া যায় না। দয়ারাম সাহানীর মতে 'সারঙ্গনাথ' শিবেরই একটি নাম। তিনি মনে করেন এই স্থানের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে 'সারনাথ' নামে যে শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দির এখনও আছে তাহা হইতেই এই স্থানের নাম সারনাথ হইয়াছে। (সারনাথ গাইড্ পুস্তক)

গৌতম গয়াধামে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সারনাথ আগমন করেন এবং তাঁহার প্রথম পঞ্চ শিষ্য কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, বাষ্প, মহানাম ও ভদ্রিককে বুদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান তত্ব ২৫৩৪ বৎসর পূর্ব্বে সারনাথেই প্রথম শিক্ষা দেন। এন্‌সাইক্লোপি-ডিয়া বৃটানিয়া গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৭১৪ পৃষ্ঠায় লেখক বলিয়াছেন :—

The original city of Benares (Kashi) is supposed to have been at Sarnath, 3½ miles north of the present city, where ruins of brick and stone buildings, with three lofty Stupas still standing over an area almost half a mile long and by a quarter of a mile broad.

Sakyamuni, the Buddha came here from Gaya in 6th century B. C. (from which some of the ruins may date) which shows that the place was even then a great centre, Hwen Tsang, the celebrated Chinese Pilgrim, visited Benares in 7th century A. D. and described it as containing 30 Buddhist Monasteries with about 3000 monks and 100 Temples of Hindu Gods."

অর্থাৎ মূল বারাণসী সহর সারনাথেই অবস্থিত ছিল। সেখানে তিনটি উচ্চ স্তূপ এখনও দণ্ডায়মান আছে ; বহু ইষ্টক ও প্রস্তরের হর্ম্মের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। এই স্থানটি ছিল আধ মাইল লম্বা আর সিকি মাইল চওড়া। শাক্যমুনি এই স্থানে আসিয়া প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময়ের সৌধাবলীর ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু এখনও সারনাথে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে কাশীধামে আগমন করেন তখন তিনি সে স্থানে ৩০টি বৌদ্ধ বিহার, ৩০০০ তিন হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষু এবং একশত হিন্দুদের দেউল দেখিতে পান।

চীন পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে যে—"এই দেশের পরিধি ৪০০০ চারি সহস্র 'লী'। গঙ্গা ইহার সীমানা। ১৮।১৯ লী লম্বা ও ৫।৬ লী প্রস্থ এই নগর। অভ্যন্তরে

যাইবার বিরাট তোরণটি দাঁতওলা চিরুণীর মতন! নগরটি বহু জনাকীর্ণ। অধিবাসীরা বিত্তশালী, তাহাদের তৈজস পত্র সমূহ মূল্যবান। শান্ত স্বভাবের মানব অধ্যয়নে সকলেই নিবিষ্ট, অল্প সংখ্যক লোকই তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মে আস্থাবান। দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। শস্য প্রচুর উৎপন্ন হয়। বৃক্ষ সকল ফলভারে অবনত। এখানে ত্রিশটি সঙ্ঘারাম আছে এবং ৩০০০ তিন সহস্র শ্রমণ বাস করে। তাহারা 'সম্মতিয়' নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত।

এখানে ১০০ একশত হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে। দশ সহস্র পূজারী সে স্থানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মহেশ্বরের পূজা করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শির মুণ্ডন করে, কেহ কেহ শিখা বাঁধে। কেহ বা উলঙ্গ থাকে, কেহ কেহ সমস্ত শরীরে ভস্ম মাখে।

অধিকাংশ সাধকই শরীরকে ক্লেশ দিয়া কৈবল্য লাভ করিতে চাহে। একা রাজধানীর মধ্যেই বিশটি দেবমন্দির। তাহাদের চূড়া ও দালান সূক্ষ্ম কারুকার্য্য পূর্ণ পাথর ও কাষ্ঠের দ্বারা নিৰ্ম্মিত। চারিদিকের বড় বড় বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সুশীতল ছায়া বিতরণ করিতেছে। নির্ম্মল নদীর স্রোত চারিদিকে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। মধ্য স্থানে মহেশ্বর দেবতার শত ফুট উচ্চ তাম্র মূর্ত্তি (বিশ্বনাথের মুর্ত্তি) বিরাজিত। মূর্ত্তিটি যেমন প্রকাণ্ড তেমনই গম্ভীর, স্থির, ঠিক যেন জীবন্ত মানবের প্রতিচ্ছবি।

এই রাজধানীরই উত্তর পূর্ব্বে বরণা নদীর পশ্চিমে সম্রাট অশোক দ্বারা নির্ম্মিত বিরাট স্তূপ দণ্ডায়মান। স্তূপটি একশত ফুট উচু। বরণার উত্তর পূর্ব্বে প্রায় ১০ 'লী' দূরে বুদ্ধের প্রথম পঞ্চ শিষ্যদের সঙ্ঘারাম অবস্থিত। বুদ্ধের তপস্যার সময়ের সহচর ও শিষ্য কৌণ্ডিণ্য, মহানাম, বাষ্প, অশ্বজিৎ ও ভদ্রিক নামক পঞ্চ সন্ন্যাসী বুদ্ধকে ত্যাগ করিয়া সারনাথে আসন পাতিয়াছিল।

এই সঙ্ঘারামটি আট কুঠারীতে বিভক্ত। সৌধটির প্রতি তলা, চূড়া, ছাঁচা, কার্ণিস, অলিন্দার সকল স্থানেই সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। অতি মনোরম স্থাপত্য কৌশলে পূর্ণ। প্রায় পনর শত বৌদ্ধ শ্রমণ নিত্য এই স্থানে পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মের বাণী সমূহ অধ্যয়ন করে। স্থানটির মধ্যভাগ এক বৃহৎ প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত, তাহারই মধ্যে দুই শত ফুট উচ্চ একটি বিহার বিরাজিত। তাহার শীর্ষদেশে আমলকী ফলের ন্যায় স্বর্ণ মণ্ডিত এক বৃহৎ কলস স্থাপিত। সৌধের ভিত, পোস্তা, সোপান শ্রেণী সবই প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু চূড়া, দেয়াল, কুলঙ্গী সবই ইষ্টকের। কুলঙ্গী পর পর এক এক সারিতে চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। প্রত্যেক কুলঙ্গীর মধ্যে সোনার বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত। বিহারের মধ্যস্থলে পূর্ণাবয়বের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন মুদ্রায় অতি মনোরম তাম্র-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

এই বিহারের ঠিক দক্ষিণ পশ্চিমে রাজা অশোক নির্ম্মিত

বিখ্যাত প্রস্তরের 'ধর্ম্মরাজিকা' স্তূপ। যদিও ইহার অনেক অংশের ভিত পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তথাপি তাহার শত ফুট উচ্চ দেয়াল তখনও বর্ত্তমান। এই স্তূপেরই সম্মুখে সত্তর ফুট উচু মুকুরের মতন নির্ম্মল ও মসৃণ প্রস্তরের স্তম্ভ দণ্ডায়মান। ইহার গাত্র এমনই শুভ্র ও উজ্জ্বল যে সম্মুখে দাঁড়াইলে দর্শকের সমগ্র অবয়ব প্রতিবিম্বিত হয়। এই স্থানে তথাগত প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এই সৌধের পার্শ্বেই একটি স্তূপ দেখা যায়, এই স্থানে কৌণ্ডিণ্য প্রভৃতি পঞ্চ শিষ্য প্রথমে আসিয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্তূপটির পার্শ্বেই অপর একটি স্তূপ বর্ত্তমান। এই স্থানে পাঁচ শত প্রত্যেক বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করিবার পর তাঁহাদের দেহ পতিত হইয়াছিল। আর যে তিনটি স্তূপ দেখা যায়, সেইগুলি পূর্ব্ববর্ত্তি তিন বুদ্ধের স্থান ছিল। সর্ব্বশেষে একটি স্তূপ আছে যে স্থানে তথাগত মৈত্রেয়ের বুদ্ধত্ব লাভের বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।"

হিউয়েন সাংএর বর্ণিত স্তূপ, বিহার ও সঙ্ঘারামগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের সময় বারাণসীধামে এক ধাম্মিক শ্রেষ্ঠী বাস করিত। তাহার পুত্র নন্দিয় পিতার মনোনীত রেবতী নামে সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হয়। তাহার মাতা রেবতীকে তাহার বাটীতে আনায়ন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সেবায় নিযুক্ত করেন। রেবতীর সেবাকুশল ও বুদ্ধদেবের প্রতি

প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়া নন্দিয় রেবতীকে বিবাহ করে। নন্দিয় তাহার পিতার মৃত্যুর পর যখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইল, তখন তাহার পত্নির অনুরোধে ঋষি পত্তনে বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যবর্গের বাসের নিমিত্ত একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাই বুদ্ধর সময়ের বিহারদ্বয়ের অন্যতম। কিন্তু তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

সারনাথের অতীতের ঐশ্বর্য্য কথা প্রথম আমরা পাই ফা-হিয়ানের বর্ণনায়। তিনি পাটলিপুত্র হইয়া কাশীতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লেখা আছে যে—"গঙ্গার ধার দিয়া পশ্চিম মুখে বার যোজন আসিয়া আমরা কাশী সহরে উপস্থিত হই। এই নগরের ১০ লী উত্তর পূর্ব্বে ঋষিদের ঋষিপত্তন মৃগদাব। এই উদ্যানে এক সময় প্রত্যেক বুদ্ধ বাস করিতেন। যখন প্রত্যেক বুদ্ধ দৈববাণী শুনিলেন যে—রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র গৃহ ত্যাগ করিয়া গয়াতে ঘোর তপস্যায় রত, সাত দিনের মধ্যে চরম জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধত্ব পাইবেন এবং এই স্থানে আগমন করিবেন তখন তাঁহারা সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ কৌণ্ডিণ্য আদি পাঁচজন সহ-তপস্বীগণকে সত্যজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য এই স্থানে আগমন করিলেন, তাঁহারা বুদ্ধের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করিতে মনস্থ করা সত্ত্বেও যখন বুদ্ধকে তাঁহাদের নিকটে আসিতে

দেখিলেন তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তাঁহাকে নতশিরে অভিবাদন করিলেন। সেই স্থানে একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত স্থানগুলির উপরও স্তূপ ও বিহার গঠিত হইয়াছে। যথা—ষাট পা দূরে যেখানে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া বুদ্ধদেব বসিয়া পাঁচজন শিষ্যকে প্রথম ধর্ম্মকথা বলেন এবং ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন সেই স্থানে; ইহার বিশ পা উত্তরে যে স্থানে বুদ্ধ মৈত্রেয়কে ভবিষ্যৎ বাণী বলেন সেই স্থানে; যে স্থানে হস্তিযুথ বুদ্ধকে তাহাদের মুক্তির পথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই সব সৌধ এখনও আছে। এই স্থানের (মৃগদাবর) মধ্যস্থলে তুইটি বৃহৎ সঙ্ঘারাম ছিল। যাহাতে এখনও শ্রমণ ও ভিক্ষুগণ বাস করিতেছে। তাহার পরও যুগে যুগে সারনাথে বহু বিহার ও স্তূপ নির্ম্মিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্বেত হূণজাতির নেতা মিহিরকুলের অত্যাচারে সারনাথের স্থাপত্য ও সৌধাবলী প্রথম বিধ্বস্ত হয়। সেই সময়ের পর হইতে হিউয়েন সাংএর ভারত ভ্রমণের সময় পর্য্যন্ত সারনাথে নূতন কোন সৌধ নির্ম্মাণের সংবাদ পাওয়া যায় না।

একাদশ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ গজ্‌নভী এবং দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে (১১৯৪ সালে) কুতবুদ্দীন সারনাথের বৌদ্ধবিহার ও স্তূপগুলি নির্ম্মম ভাবে ধ্বংস করিয়া পৃথিবী হইতে এক বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ শিল্প ঐশ্বর্য্য চিরকালের মত লুপ্ত করিয়া দয়িাছিল। তিনটি স্তূপ কেবল আংশিক ভাবে রক্ষা

পাইয়াছে, সেই তিনটি স্তূপ—ধামক, ধর্ম্মরাজিকা, চৌখণ্ডী—অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান ছিল।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর রাজা চেৎসিংহের দেওয়ান জগৎ সিংহ কাশীধামে একটি গঞ্জ (জগতগঞ্জ) প্রস্তুত নিমিত্ত সারনাথের ধর্ম্মরাজিকা স্তূপটি ভাঙ্গিয়া মালমসলা সংগ্রহ করেন। এই অপকর্ম্মের মর্ম্মান্তিক বিবরণে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল দয়ারাম সাহানী লিখিয়াছেন—"১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বেনারসের জগৎগঞ্জ বাজার নির্ম্মাণের জন্য রাজা চেৎসিংহের দেওয়ান জগৎসিংহ বিখ্যাত ধর্ম্ম-রাজিকা স্তূপটি ভূমিসাৎ করিয়া মাল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তখনও এই বৃহদাকার সৌধের ১১০ ফুট ব্যাস ছিল। প্রিয়দর্শী রাজা অশোক ধর্ম্মরাজিকা স্তূপটি নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। স্তূপটি খননের সময় তাহার মধ্য হইতে দুইটি বেলে পাথরের ও মার্ব্বেল পাথরের কৌটা পাওয়া গিয়াছিল। একটি কৌটার মধ্যে আর একটি ছিল। মর্ম্মর প্রস্তরের পেটিকার মধ্যে মানব অস্থি, ক্ষয়া মুক্তা, সোনারপাত পাওয়া গিয়াছে। একটি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সেই স্তূপে পাওয়া গিয়াছিল—যাহার পাদপীঠে ১০৮৩ সম্বৎ খোদিত আছে।"

ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সারনাথে বৌদ্ধ প্রভাব ১০৮৩ সম্বৎ পর্য্যন্ত ছিল। তখনও বৌদ্ধগণ স্তূপ, বিহার, চৈত্য, সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিত। দয়ারাম সাহানী আরও বলিয়াছেন—"দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন মুসল-

মান আক্রমনকারীর দ্বারা সারনাথে ধ্বংসলীলা চলিয়াছিল তখন সারনাথে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের দেবদেউল প্রচুর ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি হয় পুরাণ সংস্কৃত সৌধ বা নব নির্ম্মিত। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ব বিভাগ খনন করিয়া তাহাদের প্রমাণ বাহির করিয়াছেন। ১৯১৮ সালে প্রধান মন্দিরের প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে একটি মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া যায়, সেটি বরাহদেবকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। অবশ্য বৌদ্ধ প্রভাব ম্লান হইতে আরম্ভ হইবার সময় হইতেই প্রধান মন্দিরেও হিন্দু দেব-দেবীর প্রাদুর্ভাবেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। গর্ভ-মন্দিরের পূর্ব্বকোণে ২´-৬´´ উচ্চ ও ৩´ প্রস্থ একটি বসা ভৈরব মূর্ত্তি অটুট্ অবস্থায় স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক স্থানে এক বেদীর উপর পাঁচটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল।" (সাহানীর গাইড, পৃঃ ২৩)

একদল মূর্ত্তি পূজা বিদ্বেষী বিধর্ম্মী যেমন সারনাথের অপূর্ব্ব অতুলনীয় মনোরম শিল্প সম্ভার বিধ্বস্ত করিয়া জগতের সভ্যতার নিদর্শনের ক্ষতি করিয়াছে—আবার তেমনই একদল শিল্পানুরাগী সুসভ্য বিদেশী বিধর্ম্মী পণ্ডিত ভারতের অতীত শিল্প ঐশ্বর্য্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারা ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া সভ্য জগতের সুধীজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে সারনাথ ধ্বংস হইয়া যাইবার পর ছয় শত বৎসর সারনাথ মৃত্তিকা গর্ভে সমাধিস্থ ছিল। তাহা একটি মাটির পাহাড়ে পরিণত হইয়া যায়। সেখানে

সত্যের সন্ধানে আর কেহ যাইত না, সত্যের বাণী ছয় শত বৎসর সারনাথ হইতে ধ্বনিত হয় নাই।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয়েক জন অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিত সারনাথের অতীত গৌরব ও লুপ্ত মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রকৃত রূপ দেখিবার জন্য মৃত্তিকার ঢিবি খনন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কর্ণেল ম্যাকেঞ্জি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে, ১৮৩৪।৩৫ সালে স্যার আলেকজেণ্ডার কানিংহ্যাম, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মেজর কিটো, ১৮৬০ সালের পর টমাস সাহেব দফায় দফায় খনন করিয়া অতীত গৌরবের বহু চিহ্ন পাইয়াছিলেন।

১৮৩৪ সালে মিস্ এল্মা রবার্টস লিখিয়াছেন যে— "বৈজ্ঞানিক প্রত্নতাত্বিকগণের চেষ্টায় সারনাথের মৃত্তিকার ঢিপি খনন করা হয় এবং প্রচুর পোড়া ইট ও টালি পাওয়া যায়। টালিগুলির উপর বুদ্ধ মূর্ত্তির ছাপ ছিল, এইরূপ গাড়ি গাড়ি শিল্প সম্ভার আবিষ্কৃত হইয়াছিল।"

তারপরও সারনাথ কিছুকাল আবার মাটি চাপাই থাকে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার একজন নীলচাষী মিঃ ফার্গুসন সাহেবের নিকট হইতে সারনাথের বৌদ্ধমণ্ডলটি ক্রয় করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অনাগারিক ধর্ম্মপাল সারনাথে যখন প্রথম গমন করেন তখন তিনি ধ্বংসাবস্থায় ধামকা স্তূপের ঢিপি এবং ভগ্ন জৈন মন্দির ব্যতীত আর কিছু দিখিতে বা চিনিতে পারেন নাই। কেবল নির্জ্জন শূকর

চরণভূমি দেখিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই সারনাথ হইতে কারুকার্য্যমণ্ডিত প্রস্তর ও ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া বারাণসীর কুইনস কলেজের সৌধ এবং বরণার পোল নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়।

১৯০৫ সালে ভারতে প্রত্নতত্ত্ব-অনুসন্ধানকারীদের পরম-প্রিয় ও উৎসাহ দাতা লর্ড কার্জ্জনের অনুপ্রেরণায় সারনাথের লুপ্ত ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যাপক ভাবে খনন কার্য্য আরম্ভ হয়। সেই সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর নিয়মিতভাবে খনন কার্য্য সম্পাদিত হয়। তাহার ফলে অতীতের অনেক মূল্যবান শিল্পসম্ভার আবিষ্কৃত হয়। তাহাদের অধিকাংশ স্থানীয় সংগ্রহালয়ে (মিউজিয়ামে) সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে সজ্জিত আছে। ১৯০৫ সালে যখন লর্ড কার্জ্জন সারনাথে খনন কার্য্যের প্রারম্ভে প্রথম কোদাল ভগ্নস্তূপের উপর আঘাত করেন সেই দিনের অনুষ্ঠান দেখিবার সৌভাগ্য লেখকের হইয়াছিল। তখনও স্থানটি জন-মানব-হীন ধূ ধূ মাঠ মাত্র, স্থানে স্থানে মাটির ঢিপি। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত খনন চলিতেছিল, সেই সময়ের মধ্যে কয়েকবার সারনাথে গমন করিয়া নব নব আবিষ্কৃত সৌধের ধ্বংসাবশেষ ও প্রস্তর শিল্প সম্ভার দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম।

পৃথিবীর অপূর্ব্ব শিল্প ও স্থাপত্য ঐশ্বর্য্য মানব কিরূপ নির্ম্মম ভাবে ধ্বংস করিতে পারে তাহা কল্পনাতীত। ধ্বংসলীলা

কি প্রকারে আচম্বিতে সাধিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ সাহানী ও অর্টেল সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন। খনন কার্য্য চালাইবার সময় কিটো সাহেব যে বিহার খনন করিয়া ছিলেন সেই স্থানের এক কুটীর মধ্য হইতে মাটির পাত্র, রন্ধিত ভাত ও ডাল তিনি পাইয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া সারনাথের স্বরূপ, অতীত গৌরব, শিল্প-ঐশ্বর্য্য আমাদের দেখিবার ও পরিচয় পাইবার সুযোগ দিয়া ধন্য হইয়াছেন। ইহাই সারনাথের পূর্ব্ব ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সার।

বর্ত্তমানের সারনাথ অতীত গৌরব বক্ষে রাখিয়া নূতন নূতন আকর্ষনীয় বিহারআদি নানা সৌধ ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা নব রূপ ধারণ করিয়া বৎসর বৎসর দেশ বিদেশের শত শত দর্শকগণকে আকৃষ্ট করে। সেই জন্য কবি গাহিয়াছেন—

মুনির শিরোমণি ! হৃদয় ধনে ধনী
চিন্তামণি মালা তোমারে ঘিরিয়া ভায়।
বসিয়া ধ্যানলোকে নিখিল ভরা শোকে
আজো কি শতধারা কমল আঁখি ছায় ?
মমতাময় ছবি তোমারে কোলে লভি
ভূষিত হল ধরা স্বরগ সুষমায়।
করুণা সিন্ধু হে ভুবন ইন্দু হে
ভিখারী জগময়ী ! প্রণতি তব পায় ॥

—সত্যেন্দ্র দত্ত

বর্ত্তমান সারনাথের প্রধান প্রধান আকর্ষণ বুদ্ধদেবের

পদরেণু পূর্ণ পুণ্যস্থান, বৌদ্ধধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের স্মৃতি চিহ্ন, অতীতের শিল্প সম্ভার, আর বর্ত্তমানের মূলগন্ধকুটী ও মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠানগুলি।

বারাণসী হইতে উত্তর মুখে গমন করিয়া বরণার উপর সেতু পার হইয়া উত্তর দিকে রাস্তা দিয়া এক মাইল গমন করিবার পর একটি বৃক্ষসারিযুক্ত পথ পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে। সেই রাস্তা যেখানে গোরক্ষপুর যাইবার রেল পথের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সংযোগ স্থান হইতে একটি পীচমণ্ডিত তুই পার্শ্বে আম্রবৃক্ষসারি-শোভিত মনোরম পথ উত্তর দিকে গিয়াছে। সেই পথ ধরিয়া অর্দ্ধ মাইল গমন করিলে সারনাথ রেল ষ্টেসন। তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে পথের বাম পার্শ্বে চৌখণ্ডি স্তূপ এবং সেই স্থান হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তরে বর্ত্তমান সারনাথ অতীত স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া নব কলেবরে শোভা পাইতেছে।

চৌখণ্ডিস্তূপ

চৌখণ্ডি স্তূপ একটি প্রাচীন স্তূপের কঙ্কাল। তাহার শিরে অষ্টকোণ-বিশিষ্ট সমতল ছাদের ইষ্টক নির্ম্মিত একটি গম্বুজ আছে। ইহার গাত্রে একটি প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে যে, মোগল সম্রাট আকবর তাঁহার পিতা হুমায়ুন বাদশার সারনাথে আগমন স্মরণার্থে ঐ গম্বুজ নির্ম্মাণ করেন। স্তূপটি যে কেন চৌখণ্ডি নামে খ্যাত তাহার মীমাংসা কানিং-

হ্যাম আদি পণ্ডিতগণ ঠিক করিতে পারেন নাই। ১৮৩৫ সালে কানিংহ্যাম এই স্তূপটি খনন করেন। তখন ইহার উচ্চতা সমতল ভূমি হইতে ৯৭´।৮´´। তিনি উপর হইতে স্তূপটির অভ্যন্তরে সোজা নীচের দিকে খনন করিয়া দেখিয়াছিলেন, সৌধটি ভরাট ইটের গাঁথুনী। কোন পবিত্র দ্রব্য বা কোন ঘরের সন্ধান পান নাই।

হিউয়েন সাংএর বর্ণনা মতে মৃগদাবের প্রধান মঠ বা সঙ্ঘারামের ৩ 'লী' বা অর্দ্ধমাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এই স্তূপ অবস্থিত এবং স্তূপটি প্রায় ৩০০ ফুটের কম উচু হইবে না। স্তূপ গাত্র মহামুল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য দ্বারা মণ্ডিত। স্তূপটি এখনও হিউয়েন সাংএর সেই নির্দ্ধারিত স্থানেই অবস্থিত। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, এই স্থানেই বুদ্ধদেব প্রথম কৌণ্ডিণ্য আদি পঞ্চ শিষ্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। স্তূপের শিরোদেশে এখনও উঠা যায়। এখানে মোগল সংস্কৃতির চিহ্ন নাই। স্তূপের পাদদেশে একটি বাঁধান কূপ দেখা যায়। কূপটি অধিক পুরাতন নহে।

ধামেক স্তূপ

চৌখণ্ডি স্তূপ হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তরে গমন করিলে সারনাথের অতীত ঐশ্বর্য্যের স্বরূপের কঙ্কাল অবস্থিত। তাহারই মধ্যস্থলে 'ধামেক' স্তূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া বুদ্ধদেবের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। সেই স্থবির, গম্ভীর, অচলায়তন

চৌখণ্ডি স্তূপ—সারনাথ

ধামেক স্তূপ ও মূলগন্ধকুটী —সারনাথ

সৌধ এখনও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এই স্তূপ স্পর্শানুভূতিতে মহিলা কবি বলিয়া উঠিলেন—

স্তূপ, ওগো স্মরণীয় স্তূপ,
বাণী কেন নাহি মুখে, কেন মৌন চুপ!
রহো কি সমাধি মগ্ন হে মহাস্থবির,
আনি যত স্তব স্তুতি একান্ত বধির।
ভ্রূক্ষেপ নাহিত তাহে, ধ্যান শুধু ধ্যান,
শুদ্ধ লোকে লভিতেছ কোন সত্য জ্ঞান।
কার পুণ্যস্মৃতি চিহ্ন যুগ যুগ ধরি
ধরিয়া রেখেছ নিজ উচ্চ শিরোপরি॥

—শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর।

ধামেক স্তূপ সমন্ধে হিউয়েন সাং লিখিয়াছেন—"অশোকের নির্ম্মিত ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের সন্নিকটস্থ বৃহৎ সঙ্ঘারাম সৌধের পার্শ্বে আর একটি স্তূপ আছে। কৌণ্ডিণ্য প্রভৃতি পঞ্চ সাধু যাঁহারা বুদ্ধকে গয়াতে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের প্রথম দীক্ষা এই স্থানটিতে বুদ্ধ দিয়াছিলেন।"

কানিংহ্যাম সাহেব ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন (আর্কিয়লজিক্যাল রিপোর্ট ১৮৬১-৬২, ১০৭ পৃষ্ঠা)—এই স্তূপ একটি গোলাকার নিরেট উচ্চ সৌধ। তলার ব্যাসের পরিধি ৯৩ ফুট এবং খাড়াই ১১০ ফুট, তবে সমতল ভূমি হইতে মোট ১২৮´ উচ্চ। মেঝের নিম্নে আরো ২৮ ফুট ভিত আছে। স্তূপের নিম্নাংশ ৪৩ ফুট পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তর দ্বারা গঠিত।

প্রস্তর খণ্ডগুলি পরস্পর লৌহ কীলক দ্বারা সংযুক্ত। উপরাংশ বড় বড় পোড়া থান ইট দ্বারা নির্ম্মিত। বহিভাগ অনেক দিন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় এক স্তর পাথর বা চূণের পলস্তারের দ্বারা আবৃত ছিল। আমার বিশ্বাস পলস্তারের দ্বারাই উপরাংশ আবৃত ছিল। মাথাটি ঘণ্টাকারে অর্দ্ধগোলাকার। মাথায় একটি ইটের শিরভূষণ যাহার ব্যাস ৮ ফুট এবং ৪ ফুট উচু। আমার মনে হয় ইহা একটি ছত্রর পাদপীঠ।

স্তূপের নিম্নাংশ আটটি পলে বিভক্ত, প্রত্যেকটি ২১´।৬´´ প্রস্থ এবং কিঞ্চিৎ বাহিরাগত, প্রত্যেকটির মধ্যে ১৫ ফুট ব্যবধান। প্রতি পল ২৪ ফুট উচু, উপরিভাগে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি অর্দ্ধগোলাকার খিলানের মতন একটি করিয়া কুলঙ্গী গঠিত আছে। প্রত্যেকটি কুলঙ্গীর মধ্যে মূর্ত্তি রাখিবার এক ফুট উচু পাদপীঠ এখনও আছে। এই পাদপীঠে নিশ্চয় বুদ্ধ মূর্ত্তি বসান ছিল। মূর্ত্তিপূজা-বিরোধিগণ এইগুলি অপহৃত বা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এই অংশের পাথরগুলির উপর অতিসুদৃশ্য ও সূক্ষ্ম লতানে কারুকার্য্য খোদিত আছে। তাজমহল ব্যতীত ভারতের অন্য কোন সৌধ সারনাথের এই বৌদ্ধ স্তূপের ন্যায় এত অধিক বর্ণিত হয় নাই।” কানিংহ্যাম বলেন—

“With the single exception of the Tajmahal of Agra, there is parhaps, no Indian Building

that has been so often described as the great Buddhist tower near Sarnath."

১৮৩৫ সালের ১৮ই জানুয়ারী কানিংহ্যাম সাহেব ভারা বাঁধিয়া প্রথম ইহার মাথায় উঠিয়াছিলেন। তিনি ইহার মধ্যে শলা চালাইয়া অবস্থা পরীক্ষা করেন। মাথা হইতে তিন ফুট নীচে তিনি একখানা ২৪″ × ১৫″ × ৭″ মাপের প্রস্তর ফলক পান। তাহার উপর উৎকীর্ণ ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল সূত্রটি—'যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা' ইত্যাদি। তাহার ভাবার্থ —'কারণ হইতেই সমস্ত ঘটিয়া থাকে, তাহার তত্ত্ব কথাই তথাগত বলিয়াছেন।' এই প্রস্তর ফলক কলিকাতার যাত্নঘরে (মিউজিয়ামে) রক্ষিত আছে। কানিংহ্যাম বলেন—"এই অক্ষরগুলির আকার তিব্বতীয় অক্ষরের পূর্ব্ব সময়ের। তিব্বতীয় বর্ণমালা ভারতে সপ্তম শতাব্দী হইতে প্রচলিত, এই রূপ মত পণ্ডিতগণ পোষণ করেন। অতএব এই স্মৃতিস্তম্ভ ষষ্ঠ শতাব্দী বা তাহারও পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।"

ধামেক নামের সার্থকতা বোঝা যায় না। কানিংহ্যাম বলিয়াছেন—'ধামেক' বোধ হয় 'ধর্ম্ম উপদেশক' কথার সংক্ষেপ।

ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ

এই স্থান হইতে ৫২০ ফুট পশ্চিমে ৫০ ফুট ব্যাসের বৃত্তাকার স্তূপের ইষ্টক বনিয়াদ এখনও দেখা যায়। ইহাই অশোক নির্ম্মিত—'ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ'এর অবশিষ্ট অংশ।

কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারের পুর্ব্বে বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে অনাগারিক ধর্ম্মপাল ১৯২০ সালে যে পাথরের সুদৃশ্য বিহার মহাবোধি সোসাইটীর জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার নাম 'ধর্ম্মরাজিকা বিহার' রাখা হইয়াছে। কলিকাতার বিহারটি স্বর্গীয় মনমোহন গাঙ্গুলি স্থপতি বিশারদ প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের স্থাপত্য ধারার অনুকরণে গঠিত করিয়াছিলেন। সম্মুখভাগ অজন্তারের বিহারের পরিকল্পনায় প্রস্তরের দ্বারা গঠিত, অভ্যন্তরের দালানের দেয়ালের গাত্র ও ছাদতল বুদ্ধর জীবনের নানা লীলা ও ঘটনার চিত্র বিচিত্র রংএ চিত্রিত হইয়াছে। উপরি তলায় কাল পাথরের 'দাগোবা' স্থাপিত। তাহার মধ্যে বুদ্ধর পবিত্র দেহাংশ রক্ষিত আছে। এই পবিত্র স্মৃতি বস্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার পক্ষে বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড রনাল্ডসে মহাবোধি সোসাইটীর তদানীন্তন সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে প্রদান করেন। মিসেস্ এ্যানি বেশান্ত, অনাগারিক ধর্ম্মপাল ও স্যার আশুতোষকে পুরোভাগে রাখিয়া এক বিরাট মিছিল গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে সেই পবিত্র স্মৃতি কলেজস্কোয়ারস্থিত নবনির্ম্মিত ধর্ম্মরাজিকা বিহারে আনয়ন করা হয়। সমস্ত পথই মিছিলে যোগদানকারী বিচিত্র বসনে, নানা রংএর বস্ত্রে ভূষিত ব্যক্তিগণ নগ্নপদে আগমন করেন। বিহারটি নির্ম্মাণার্থে মিসেস্ ফষ্টার ৬৫,১২৩৲ ধর্ম্মপাল ১০,০০০৲ বরদার গাইবাড় ১০,০০০৲ দান করেন।

সারনাথের ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের ধ্বংসাবশিষ্টের মধ্যে বিশ ফুট নীচুতে কানিংহ্যাম সাহেব দয়ারাম সাহানী বর্ণিত পাথরের চতুষ্কোণ আধারটি খনন করিয়া আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। এই খানেই ১০৮৩ সম্বৎ উৎকীর্ণ বুদ্ধমূর্ত্তিটি পাওয়া যায়। মেজর কিটো যখন এই মূর্ত্তিটি জগৎগঞ্জ হইতে উদ্ধার করেন তখন তাহাতে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ ছিল তাহার পাঠার্থ কানিংহ্যাম দিয়াছিলেন :—

"গৌড়েশ্বর রাজা মহীপাল বারাণসী ধামে হ্রদ মধ্যে উদ্ভাসিত পদ্মপুষ্পতুল্য ধর্ম্মশ্রীর (বুদ্ধের) চরণ কমল পূজা করিয়া শতশ্রীমান্ রাজা মস্তকের কেশগুচ্ছের ন্যায় নিবিড় পুষ্পগুচ্ছ প্রদান করেন, এবং কাশীতে শত শত ঈশান (প্রদীপ) স্তম্ভ ও বিচিত্র ঘণ্টা নির্ম্মাণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। স্থিরপাল ও তাঁহার কণিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবসন্ত পাল এই স্তূপ ও তাহার অভ্যন্তরীন ৮টি কুলাঙ্গী নির্ম্মাণ করিয়া দেন।" (আর্কিও-লজিক্যাল রিপোর্ট, পৃঃ ১১৪)।

কানিংহ্যাম লিখিয়াছেন এই স্তূপটি যুগে যুগে যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে তখন তাহার বাহিরের গাত্র বেষ্টন করিয়া তাহারই উপর পুনঃ পুনঃ এক এক স্তর গঠিত হওয়াতে স্ফীতকায় হইয়াছে। স্থিরপাল ও বসন্তপাল ১০২৬ খৃষ্টাব্দে এই স্তূপ মেরামত করিয়া আর একবার বাহিরের অঙ্গে এক স্তর গাঁথিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

প্রধান মন্দির

প্রধান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ধর্ম্মরাজিকা বিহারের উত্তরই অবস্থিত। কানিংহ্যাম সাহেব ইহারও খনন কার্য্য প্রথম আরম্ভ করেন, পরে মেজর কিটো ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে খনন কার্য্য শেষ করিয়া মন্দিরের স্বরূপ ও গঠন পরিকল্পনা বাহির করিয়া দিলেন। কানিংহ্যামের খনন সময়ে মন্দিরের আয়তনের মধ্যে ১৩´।৯´´ মাপের চতুষ্কোণ পাড় বাঁধান পুষ্করিণীর মতন একটি অঙ্গন আবিষ্কার হয়। ইহার চারিদিকে জোড়া জোড়া ভগ্ন স্তম্ভের পাদ-পীঠ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

এই স্থানেই বুদ্ধের একটি ভগ্ন পরিনির্ব্বাণ মূর্ত্তি পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিটি কলিকাতার যাদুঘরে সংগৃহীত আছে। সাধারণতঃ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ মূর্ত্তি শায়িত অবস্থায় দেখা যায়। মূর্ত্তির মস্তকের নিকট রাজছত্রধারী ভক্ত দণ্ডায়মান এবং কোন ভক্ত পাদস্পর্শ করিতেছেন। কিন্তু এই মূর্ত্তির বিশেষত্ব এই যে ভক্ত ও সেবক মণ্ডলী ব্যতীত এক সারিতে নবগ্রহের চিহ্ন সমস্ত খোদিত এবং পরবর্ত্তী সারিতে অষ্টশক্তি মূর্ত্তি খোদিত আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাসের যুগেরই এই সমস্ত মূর্ত্তি। আরো পরবর্ত্তী কালের খননের পর দেখা যায় যে, এই জোড়া জোড়া স্তম্ভ পাদপীঠ যুক্ত স্থানটি একটি চতুষ্কোণ সৌধের অন্দরের এক অঙ্গন। ইহার দেয়ালগুলি ৪´।৭´´ পুরু। তাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, এই সৌধটি

চার পাঁচ তলার অট্টালিকা ছিল এবং এই স্থানে পঞ্চাশ জন ভিক্ষু থাকিতে পারিত।

এই স্থানের ঠিক উত্তরে কানিংহ্যাম সাহেব একটি ছয় ফুট লম্বা, তিন ফুট প্রস্থ ও ৩ ফুট মোটা এক শিলাখণ্ড পাইয়াছিলেন। এই পাথরটির উপর বুদ্ধদেব তাঁহার কাষায় বস্ত্রটি শুষ্ক করিবার জন্য বিছাইয়া রাখিতেন—এইরূপ কাহিনী হিউয়েন সাং লিখিয়া গিয়াছেন। ধ্বংসস্তূপ খনন করিয়া জেনারেল কানিংহ্যাম, মেজর কিটো এবং টমাস সাহেব এক বৃহৎ মঠের, একটি হাসপাতালের এবং একটি স্তূপের ভিত আবিষ্কার করিরাছিলেন। একটি পোড়া মাটির মোহর পাওরা গিয়াছিল—যাহার একদিকে দুইটি মৃগর চিত্র খোদিত এবং অপর অংশে 'শ্রীধর্ম্মরক্ষিতা' নামটি উৎকীর্ণ আছে।

মূলগন্ধকুটী বিহার

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অনাগারিক ধর্ম্মপাল যখন প্রথম সারনাথ দর্শন করিতে যান তখন হইতে তিনি এই স্থানে একটি বিহার গঠন করিবার পরিকল্পনা হৃদয়ে পোষণ করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন কার্য্যে অগ্রসর হইয়া বহু সৌধ, মূর্ত্তি, ও কারুকার্য্যের নিদর্শন আবিষ্কার করেন, তখন অনাগারিক ধর্ম্মপাল সারনাথে গিয়া একটি প্রস্তর ফলক দেখিতে পান। সেই ফলকের উপর "মূলগন্ধ

কুটি" নাম খোদিত ছিল। তাহার পর হইতে ধর্ম্মপাল 'মূলগন্ধকুটি বিহার' নির্ম্মাণের উদ্যোগ করেন।

মূলগন্ধকুটীর ইতিহাস বুদ্ধর সময় হইতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের মধ্যে মন্দিরে মূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করিবার বিধি না থাকিলেও বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই মন্দির গঠনের কল্পনা সুরু হয়। বুদ্ধ যখন সারনাথে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অবস্থান করিতেন তখন বহু ভক্ত তাঁহার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য সুগন্ধ পুষ্প অর্ঘ লইয়া আসিতেন। যদি সে সময় বুদ্ধ উপস্থিত না থাকিতেন তখন একটি কুটীরের মধ্যে গন্ধ (পুষ্প) অর্ঘগুলি ভক্তগণ রাখিয়া যাইতেন। সেই কুটীর 'গন্ধ
নামে খ্যাত হয়। পরে অন্যান্য স্থানের তদনুরূপ
হইতে পৃথক ভাবে বুঝিবার জন্য সারনাথের 'গন্ধকুটি'র নাম 'মূলগন্ধকুটী' নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ প্রথমে এই কুটীরটি ইটের ছিল। তাহার পর রাজা মহীপাল ১০৮৩ সম্বতে শিলার দ্বারা এই বৃহৎ 'মূল গন্ধকুটি' বিহার পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় বন্ধুমতী নগরীর অপরাজিত নামক এক ভক্ত একটি গন্ধকুটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শারিপুত্রের ভ্রাতা রেবত একটি গন্ধকুটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই গন্ধকুটিতে বুদ্ধ স্বয়ং পদার্পণ করিয়াছিলেন। অনুরূপ গন্ধকুটী জেতবনে এবং নালন্দায় ছিল। যখন এমনই দুই তিনটি গন্ধকুটী নির্ম্মিত

হইল, তখন সারনাথের গন্ধকুটীর নাম 'মূলগন্ধকুটী'রূপে খ্যাত হইল, কারণ এইটাই প্রথম ও প্রধান গন্ধকুটী।

কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে, যে কুটীরে বুদ্ধ বাস করিয়াছিলেন তাহাই 'গন্ধকুটী' নামে খ্যাত। এই সমস্ত গন্ধকুটী বৌদ্ধবিহার বা মন্দিরের প্রথম কল্পনা বা সৃষ্টির নিদর্শন। ইহা হইতেই বুদ্ধ পূজার সূচনা দেখা যায়। এই তথ্য শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলি মহাশয় লিখিয়াছেন—"Any how the Gandha Kutis must have been the nucleus of feuture Buddha Shrines or temples (Pujaniya thana) and provided indirect aids to personal adoration and were the seeds of personal worship." (The Antiquity of Buddha Image, by O. C. Gangooly)

এই গন্ধকুটীগুলি ভারতের দেবদেউল নির্ম্মাণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অশোকের বিহার, স্তূপ, স্তম্ভ ইত্যাদি নির্ম্মাণের অভিযানের পূর্ব্বে ভারতের ইট পাথরের মন্দির নির্ম্মাণের পদ্ধতি বিশেষ প্রচলিত ছিল না। দ্বিতীয় খৃঃ পূর্ব্ব শতাব্দীতে বিদিশায় বর্ত্তমান ভিলসায়, খৃঃ পূর্ব্ব ১৪০ অব্দে গ্রীক রাজদূত হিলিওডোরাস্ স্থাপিত গরুড় স্তম্ভটিই হিন্দুদের মন্দিরের সর্ব্ব প্রাচীন নিদর্শন।

সেই প্রাচীন পুণ্য 'মূলগন্ধকুটী'র স্থানে বৃহৎ উচ্চ চূড়া বিশিষ্ট প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্য রীতিতে দৃঢ়, মসৃণ চুনার প্রস্তর

দ্বারা সুদৃশ্য 'মূলগন্ধকুটী' বিহার অনাগারিক ধর্ম্মপালের চেষ্টায় হইয়াছে। বিহারটি নির্ম্মাণে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। অনাগারিক ধর্ম্মপাল ১৯০৪ সালে ভিঙ্গার রাজার অর্থানুকুল্যে বর্ত্তমান মূলগন্ধ কুটীরের ভূমি ক্রয় করেন এবং এই বিরাট বিহার নির্ম্মাণের নিমিত্ত হনলুলু নিবাসিনী মিসেস্ মেরী এলিজাবেথ ফষ্টার মহোদয়া ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

বিদিশায় বাসুদেব মন্দিরের প্রাঙ্গণে ১৪০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হিলিওডোরাস্ কর্ত্তৃক স্থাপিত গরুড় স্তম্ভ।

বর্ত্তমান বিহারের কারুকার্য্য যেমন সরল ও পরিষ্কার, ভিতরের

প্রাচীর চিত্র তেমনই বিচিত্র ও উজ্জ্বল। ভিতরের বড় দালানের মেঝে উজ্জ্বল শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর মণ্ডিত। দালানের উত্তর প্রান্তে উচু বেদীর উপর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন মুদ্রায় উপবিষ্ট অপরূপ বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। মূর্ত্তিটি পাথরের, সারনাথ যাতুঘরে রক্ষিত একটি প্রাচীন বুদ্ধ মূর্ত্তির অনুকরণে গঠিত। এমন সৌম্য, অপার্থিব, সুদৃশ্য, মনোহর বুদ্ধমূর্ত্তি ভারতে অতি বিরল।

ঐতিহাসিক যুগের স্মরণে বুদ্ধদেবই পরম পুরুষ যাঁহার মূর্ত্তির কল্পিত প্রতিচ্ছবি আমরা চিত্রে বা প্রস্তরে বহুল পরিমাণে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছি। বুদ্ধ মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ইতিহাস আমরা ফা-হিয়ানের লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে পাই। কৌশাম্বীতে যখন বুদ্ধদেব বাস করিতেছিলেন তখন তিনি একদা তাঁহার মাতা মায়া দেবীকে তাঁহার ধর্ম্ম কথা শুনাইবার জন্য স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের স্বর্গ গমনের নব্বই দিন পরে রাজা প্রসেনজিৎ অনেক দিন বুদ্ধকে দর্শন করিতে না পারিয়া ব্যথিত হন। বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়িলেন। রাজা তখন বুদ্ধের দেহাবয়ব সাদৃশ্যে একটি চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া বিহার মধ্যে যে স্থানে বুদ্ধ সাধারণতঃ উপবিষ্ট থাকিতেন সেই স্থানে স্থাপন করেন।

যখন বুদ্ধ স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং বিহারের মধ্যে প্রবেশ করিতে যান তখন সেই মূর্ত্তি স্থান পরিত্যাগ

করিয়া গমনোদ্যত হয়। বুদ্ধ সেই দারুমূর্ত্তিকে বলেন—"তুমি তোমার আসনেই প্রত্যাবর্ত্তন কর। আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেই তুমি আমার প্রতিমূর্ত্তির নমুনারূপে মানবের নিকট থাকিবে।" এই কথা শুনিয়া মূর্ত্তিটি স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই মূর্ত্তিটি বুদ্ধের সর্ব্বপ্রথম মূর্ত্তি, পরবর্ত্তী যুগে মানব ইহারই অনুকরণে বুদ্ধমূর্ত্তি চিত্রে, প্রস্তরে ও ধ্যানে ধরিয়া রাখিয়াছে। ইহার পর হইতে বুদ্ধদেব সেই বিহারের বিশ পা দক্ষিণে আর একটি বিহারে বাস করিতে থাকেন।

"When Buddha went up to Traystrimsas heaven, and preached the law for the benefit of his mother. after he had been absent for Ninty Days, Raja Prasenjit longing to see him, caused an image of him to be carved in Goursthan Chandan wood, put in the place where he (Buddha) usually sat. When Buddha on his return entered the vihara, this image immediately left its place and came forth to meet him. Buddha said to it,—"Return to your seat. After I have attained to Parinirvan, you will serve as a Pattern of my body. This was the very first of all the images (of Buddha) and that which men subsequently copied. Buddha then removed to and dwelt in a small vihara on the South side (of the other), a different place from that containing the image and twenty Space distance from it." (Travels of FA. Hien. P 56.).

মূলগন্ধকুটীরে স্থাপিত মূর্ত্তিটি যখন সারনাথে অনাগারিক

ধর্ম্মপালের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয় সে সময় সারনাথে আমার উপস্থিত হইবার ও আচার্য্যের সহিত এই মূর্ত্তি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

মূলগন্ধকুটী বিহারের প্রধান দালানের ভিতরের প্রাচীরে সুবিখ্যাত জাপানী চিত্রশিল্পী কসিটু নোসু বুদ্ধ জীবনের নানা কাহিনী অঙ্কিত করিয়াছেন। এই চিত্র অঙ্কনের জন্য ৪০,০০০, টাকা ব্যয় হয়। সেই টাকা জাপান ও অন্যান্য দেশবাসী বুদ্ধ ভক্তগণ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্বেতহস্তিরূপে মায়াদেবীর গর্ভে বুদ্ধর আবির্ভাব, লুম্বিনী উদ্যানে বুদ্ধকে প্রসব করিবার পর দণ্ডায়মান মায়াদেবী, শুদ্ধোদনকে রাজ জ্যোতিষী বুদ্ধদেবের ভবিষ্যৎ গনণা করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী বলিতেছেন, সিদ্ধার্থের যশোধরার সহিত বিবাহ, উদ্যান ভ্রমণের সময় জরা-মৃত্যু আদি দৃশ্য দর্শনের, যশোধরা ও নিদ্রিত নবজাত শিশু রাহুলকে ত্যাগ করিয়া যাইবার দৃশ্য, প্রিয় ঘোটক কণ্টক, সারথি ছন্দক, বস্ত্র, অলঙ্কার আদি পরিত্যাগ ও বিদায়ের দৃশ্য, বুদ্ধত্ব লাভের, সারনাথে পঞ্চ শিষ্য মিলন ও ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন দৃশ্য, কপিলবাস্তুতে পিতৃসকাশে আগমন ও কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তির দৃশ্যগুলির বৃহৎ আকার লেপ্য চিত্র (ফ্রেসকো) বিহারের পরম শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে।

'মূলগন্ধকুটী' বিহারের নির্ম্মাণ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। ভারত সরকার তক্ষশিলায় প্রাপ্ত বুদ্ধর অস্থি এই বিহারে

রাখিবার জন্য ১৯৩২ সালের ১১ই নভেম্বর মাসে প্রদান করেন। সেই পূত স্মারক চিহ্ন স্থাপনের দিন বিরাট উৎসবের আয়োজন ও বিপুল জন সমাগম হইয়াছিল! সে দিন উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য লেখকের হইয়াছিল। মূল্যবান হাউদা পৃষ্ঠে কিংখাপ আচ্ছাদিত হস্তিগণের, সুরঞ্জিত বস্ত্রাচ্ছাদিত উষ্ট্র সারির, সালাঙ্কৃত সুসজ্জিত অশ্বশ্রেণীর, রৌপ্য-স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ড শ্রেণী, মখমল-জরি-বারাণসীর পতাকাবাহকগণের, দেশ বিদেশের নানা জাতির হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত পরিচ্ছদে পরিহিত ভিক্ষুগণের, নানা রংএর বেশ ভূষায় সজ্জিত নর-নারীর বিরাট মিছিল এই পুণ্য স্মারক পূর্ণ আধারটি লইয়া গীত বাদ্য সহ বিহার প্রদক্ষিণ করে। ধূপ ধুনার গন্ধে পূর্ণ, পুষ্প মাল্যের সজ্জায় ও বিচিত্র বর্ণের পতাকায় সজ্জিত হইয়া বিহারটি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল! রাত্রিতে গগনস্পর্শী বিহারের চূড়া দীপমালায় সজ্জিত হইয়া নক্ষত্রখচিত নভঃ মণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়া দর্শকদের চিত্ত পুলকে পূর্ণ করিয়াছিল।

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার যেন গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া জীবের কল্যাণ মন্ত্র প্রদান করিতেছেন এইরূপ অনুভূতি সেই দিন আমরা পাইয়াছিলাম। বৎসর বৎসর ১১ই নভেম্বর সেই প্রতিষ্ঠা উৎসব সারনাথে সম্পন্ন হয়।

আবার ১৯৪৫ সালে ৩০শে মার্চ্চ যখন সেই মূলগন্ধ-কুটীর পাদমূলে বসিয়া শ্রদ্ধেয় হেমলতা ঠাকুরের সহিত বিহার দর্শন করিতে ছিলাম তখন এক অভাবনীয় অনুভূতি চিত্তকে পুলকিত করিয়া দিয়াছিল। হেমলতা ঠাকুরের হৃদয় তন্ত্রিতেও বাজিয়া উঠিল—

গন্ধ-কুটীর গন্ধ ফুল
অর্ঘ সাজায়ে কে দিল আনি,
ফুটিয়া উঠিল অস্ফুট মুকুল
শুনালে সবারে বুদ্ধবাণী ॥
প্রভু ফিরিছেন নগরে নগরে
ফুলগুলি হেথা জাগান রয়,
সাজাইয়া রাখে থরে থরে থরে
দিগন্ত করে সুগন্ধময় ॥
মোর হৃদয়ের বনফুল দুটি
নব শিশুসম সদ্য ফোটা,
প্রভুর চরণে পড়িতেছে লুটি
এখনো ছিন্ন হয়নি বোঁটা ॥
গন্ধ-কুটীর গন্ধ-কুটীর
গন্ধ বিহীনে তুমি কি লবে,
করুণা স্পর্শে এ ফুল দুটির
জন্ম সুবাসে পূর্ণ হবে ॥

স্থির শান্ত নিস্তব্ধ জনবিরল সেই প্রদেশে যখন ধীরে ধীরে গোধূলির রাঙ্গা বর্ণে মূলগন্ধ কুটীরের সৌধ শৃঙ্গ

অলক্ত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে তখন আর চোখ ফিরাইতে পারা যায় না। ভক্তিবিনত শিরে বিহারের সোপানতলে করুণাবতারের চরণ উদ্দেশ্যে আপন হইতে শির অবনত হয়।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও সারনাথ জনবিরল স্থান ছিল। পুরাতত্ব বিভাগের খনন কার্য্য ও মহাবোধি সোসাইটীর উদ্যমে সারনাথে ধীরে ধীরে মঠ, বিহার, ধর্ম্মশালা, বিদ্যালয়, পুস্তকালয় আদি গড়িয়া উঠিতেছে।

মূলগন্ধকুটী বর্ত্তমানে যেমন দর্শকগণের চিত্তে পুলক সঞ্চার করে তেমনই ভারত সরকারের প্রত্নতত্ব বিভাগ দ্বারা স্থাপিত অমূল্য রত্নে পূরিত সুদৃশ্য প্রস্তরের সংগ্রহালয় (মিউজিয়াম) সৌধটিও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। বিস্তৃত শ্যামল তৃণ শোভিত প্রাঙ্গনের মধ্যে ভারতীয় স্থাপত্য ধারায় চুনার পাথর দ্বারা হর্ম্যটি ১৯১০ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই মিউজিয়ামের প্রধান প্রধান আকর্ষণীয় দ্রব্য—

(১) চারমাথাওলা সিংহ স্তম্ভশির। এইটী মসৃণ উজ্জ্বল ঢালাই প্রস্তরে গঠিত, ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে অশোক সারনাথে বুদ্ধের ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন স্থান চিহ্নিত করিয়া যে উচ্চ মসৃণ (মোজাইক মতন) স্তম্ভটি স্থাপন করিয়াছিলেন ইহা তাহারই শিরে অবস্থিত ছিল। স্তম্ভটিও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাহার নীচের অংশ এখনও মূল মন্দিরের পার্শ্বে প্রোথিত আছে।

সিংহশিরের তলায় বৃহদাকার বেড়ের মধ্যে চারটি চক্র

ও ছোট ছোট সিংহ, ঘোটক, হস্তি ও বৃষের মূর্ত্তি খোদিত। স্তম্ভটি ত্রিশ ফুটের অধিক উচু ছিল।

(২) একটি পূর্ণ অবয়বের দণ্ডায়মান লাল পাথরের বুদ্ধ মূর্ত্তি দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তাহার পশ্চাতে একটি আট-পলের খুটি আছে। এইটির মাথায় বৃহৎ প্রস্তরের একটি ছত্র অবস্থিত ছিল। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এই মূর্ত্তি ও ছত্রটি মথুরা হইতে সারনাথে সে যুগে আনিয়াছিলেন।

(৩) ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন মুদ্রায় একটি মূর্ত্তি সংগ্রহালয়ের সকল মূর্ত্তির অপেক্ষায় কি সৌন্দর্য্যে, কি শিল্পচাতুর্য্যে, কি ভাব উন্মদনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাব গাত্রে যে বস্ত্রাবরণের রেখা খোদিত আছে তাহা যেন স্বচ্ছ, যেই আচড়ের মধ্য দিয়া বুদ্ধের অঙ্গের শির ও দেহ সুস্পষ্ট হইয়া আছে। মূর্ত্তির পাদপীঠে পঞ্চ শিষ্যর মূর্ত্তি খোদিত আছে। মধ্যে ধর্ম্মচক্র খোদিত এবং আর একটি মূর্ত্তিতে সম্ভবত দাতার মূর্ত্তিও খোদিত। মস্তকের পিছনে প্রভামণ্ডল, তাহার দুই ধারে দুইটি পরীর মূর্ত্তি আছে। এই রূপ করুণাময় মনোহর বুদ্ধের মূর্ত্তি জগতে বিরল।

(৪) অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়ের মূর্ত্তি দুইটী সুন্দর। অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি মহাযান বৌদ্ধ ধারার প্রতীক।

(৫) প্রায় দশ ফুট উচু দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি, ইহার পশ্চাতে খুটি এবং তাহার উপর ৮ ফুট ব্যাসের প্রস্তরের ছত্র।

(৬) একটী বিরাট প্রকাণ্ড ১২´ উচু চার হাত বিশিষ্ট বিরাট শিবের মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি অসম্পূর্ণ, এক হাতে ত্রিশূল, তাহা যেন একটি দস্যুকে নিহত করিতে উদ্যত।

(৭) বিভিন্ন আকারের অনেকগুলি তারা, মঞ্জুশ্রী, ভৈরবী, সরস্বতী আদি দেবী মূর্ত্তি সজ্জিত আছে।

(৮) একটী দালানে হাজার হাজার বৎসরের পুরাণ পোড়ামাটির বড় বড় জালা, হাড়ী, ভাড়, ঘুরি, ঘটী সংগৃহীত রহিয়াছে। মাটীর তৈজস পাত্রগুলি যেমন শক্ত তেমনই মসৃণ, রঙ ঘোর লাল।

(৯) নানা আকারের পোড়া মসৃণ ও কারুকার্য্য খোদিত ইষ্টকগুলি দেখিলে সেকালের পূর্ত্তকৌশল উপলব্ধি হয়।

(১০) অনেকগুলি পাথরের শিলাখণ্ডের উপর বুদ্ধদেবের জীবনলীলা সুস্পষ্ট ভাবে উৎকীর্ণ আছে। আর কতগুলিতে সুদৃশ্য জাতকাদি চিত্রিত দেখা যায়। এইগুলি দেখিলে বুদ্ধ জীবনের ইতিহাস হৃদয়ে স্বতঃই গ্রথিত হয়।

(১১) অনেকগুলি ব্রাকেট, দ্বারের চৌকাট, সর্দ্দাল সংগ্রহীত আছে, তাহাদের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সে যুগের শিল্পিদের অনুভাবনী শক্তি, পরিকল্পনার কৌশল, খোদাই কার্য্যের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি প্রায় ১০ ফুট লম্বা সর্দ্দালের উপর এক অভিনব ঘটনার চিত্র উৎকীর্ণ।

দর্শক দেখিবেন যে সারনাথ যাদুঘরে সংগৃহীত বুদ্ধ

মূর্ত্তি-আদি মৌর্য্য যুগ হইতে পর পর যুগ অনুসারে সজ্জিত আছে এবং এই কাল বিন্যাস দ্বারা শিল্পধারার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাহার জন্য আমরা সত্যই স্বর্গগত প্রত্নতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয়ের নিকট ঋণী।

ধ্বংসাবশেষ স্থানে উঠিবার সময় প্রথমেই একটি পাথরের স্তম্ভযুক্ত উন্মুক্ত চাঁদনী অবস্থিত, ভিতরে বহু রকমের স্তম্ভ, থামের মাতলা, কার্ণিশ আদি সৌধ সম্ভার সংগৃহীত ও সজ্জিত আছে।

যে স্থানটি প্রত্নতত্ত্ববিভাগ দ্বারা খনন হইয়াছে তাহারই ঠিক পশ্চিমে ব্রহ্মদেশবাসী বৌদ্ধদের ধর্ম্মশালা ও সীমা (মন্দির) নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে "মহা বিজিতাবি সীমা" ২৪৭৮ বুদ্ধাব্দে বা ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। রেঙ্গুনের দাঁও পী ও তাঁহার কন্যা এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মন্দির মধ্যে সুন্দর শ্বেতপাথরের বুদ্ধর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন মুদ্রা মূর্ত্তি স্থাপিত।

ইহারই প্রাঙ্গনে দ্বিতল সদ্ধম্মবংস (সদ্ধর্ম্মবংশ) পুস্তকালয়। সৌধটি ২৪৭৮ বুদ্ধাব্দে ভি সাউই উই ও তৎপত্নী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

তাহারই সম্মুখে আকিয়াব নিবাসী ব্যবসায়ী ভি কিওজান ২৪৭৯ বুদ্ধাব্দে বা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মচক্র বিহার প্রস্তুত করেন। তাঁহাদের জনৈক আচার্য্য প্রধান এই সৌধতে বাস করেন।

মুলগন্ধ কুটীরের পূর্ব্বে চীনা বৌদ্ধদিগের জন্য একটি বৃহৎ চীনা মন্দির ১৯৩৯ সালে বা ২৪৮৩ বুদ্ধাব্দে চীনের ফুকিন নিবাসী মিঃ লী চুন সেং নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহারই প্রাঙ্গণে দুইটী চার কোণা পাথরের দশফুট উচু স্তম্ভ ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে। তাহার গাত্রে বুদ্ধবাণী ইংরাজী ও চীনা ভাষায় উৎকীর্ণ। মসৃণ উজ্জ্বল হলুদ রংএর মোজাইকের মেঝে, মধ্যে নানা রংএর পদ্মফুল বসান। দালানের মধ্যে সুন্দর শ্বেত পাথরের বেদীর উপর শ্বেত পাথরের বৃহৎ ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধমুর্ত্তি। কয়েকজন চীনা আচার্য্য ও ভিক্ষু নিত্য বুদ্ধবাণী পাঠ করেন। সংলগ্ন একটি ছোট ধর্ম্মশালা চীনা পরিব্রাজকদের জন্য দানবীর শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর বিড়লা মহোদয় ১৯৪১ সালে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ইহার দক্ষিণে আম্রকুঞ্জ মধ্যে মহাবোধি সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত। তথায় নিত্য আতুর ও রোগক্লিষ্ট নর-নারীর ব্যাধির চিকিৎসা হয়।

ইহারই পূর্ব্বদিকে ধর্ম্মপালের যে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনার বীজ হৃদয়ে রোপন করিয়াছিলেন তাহারই ফল এক বৌদ্ধ ইংরাজী হাইস্কুল। ইহার সৌধাবলী ব্রহ্মের আই সি এস্, ভি সান মাউ ১৯৩৭ সালে, রেঙ্গুনের মেয়র ইউ, বা, উইন, ১৯৩৯ সালে, ব্রহ্মের অর্থসচিব স্যার ইউ হার্টন আউং গীয়াউ ও তাঁহার পত্নী, কলম্বোর মিসেস সুজাতা হিউয়া বিতরণে, জাতীয় চীন সরকারের ইউনানের পরীক্ষা মণ্ডলীর

সভাপতি মহামান্য তাই-চী-টাও মহোদয়গণের দানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

মুলগন্ধকুটী ও ধামেক স্তূপের ও জৈন মন্দিরের দক্ষিণে যে রাজপথ তাহারই বর্ত্তমান নাম ধর্ম্মপাল রোড। এই রাস্তার দক্ষিণে সারনাথ মিউজিয়াম, জৈন ধর্ম্মশালা, মহাবোধি পুস্তাকাগার, সারনাথ পোষ্ট অফিস, বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনপীঠ, বিড়লার ধর্ম্মশালা, আর উত্তরে ধর্ম্মপালের আবাস। ইহারই এক অংশে অনাথ বালক আশ্রম ও অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত।

মহাবোধি সোসাইটীর পুস্তকালয়ে নিত্য দেশ বিদেশের মাসিক পত্রিকা ও দৈনিক সংবাদপত্র সাধারণের পাঠের জন্য রাখা হয়।

দানবীর শেঠ যুগল কিশোর বিড়লা একটি বৃহৎ দ্বিতল ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার কক্ষগুলি যেমন পরিষ্কার, সুদৃশ্য, আলো বাতাস অবাধগতি বিশিষ্ট, তেমনই বাসোপযোগী। এখানে বাস করিয়া সারনাথের অতীত গৌরব, মানবহিতের চিন্তা, সাধনার আসন পাতা, নিরালায় ভগবৎ চিন্তায় আত্মনিয়োগ, এমন কি স্বাস্থ্য উন্নতিও করা যায়। সেই জন্য চীন, জাপান, বর্ম্মা, সিংহল, তিব্বত, যাবা, সুমাত্রা, মালয়, কাম্বোডিয়া দেশের বৌদ্ধতীর্থযাত্রীগণ আসিয়া সুখ-সুবিধা পান। আনন্দময়ী মা, হেমলতা ঠাকুর, ব্লাস্কা সেলমা আদি সাধিকারাও এখানে বাস করিয়া তৃপ্তি পান।

ইহার প্রাঙ্গনেও দুইটি স্তম্ভে বুদ্ধবাণী উৎকীর্ণ আছে। ইহার নির্ম্মাণকাল ১৯৪২ খৃঃ।

ধামেকস্তূপের ঠিক পার্শ্বে জৈন তীর্থাঙ্কর শ্রেয়াংস নাথের বৃহৎ মন্দির। বর্ত্তমান প্রস্তরের মন্দির ১৮২৪ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত। এক মাইল দূরে সিংহপুর গ্রামেই শ্রেয়াংসনাথ সিদ্ধিলাভ করেন। এখনও এই স্থান জৈনগণ শ্রদ্ধায় দর্শন করিতে আসেন। রাস্তার অপর পার্শ্বেই জৈন ধর্ম্মশালা।

আধ মাইল পূর্ব্বে একটী উচু ঢিপির উপর সারনাথ মহাদেবের মন্দির। বড় পুষ্করিণীর পাড়ে এই মন্দির। মন্দিরের কোন স্থাপত্য গৌরব নাই। ছোট ভগ্নপ্রায় একটি মন্দির, মধ্যে শিবলিঙ্গ। চারি পার্শ্বে বৌদ্ধ স্থাপত্যের ভগ্নাংশ রক্ষিত। সারনাথের মন্দিরে প্রতি বৎসর মেলা বসে।

গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সারনাথে অনেক বার গিয়াছি কিন্তু রাত্রিবাস করিবার সুযোগ হয় নাই। পঁয়তাল্লিশ সালের এপ্রিল মাসে সাত দিন সারনাথে অবস্থান করিয়াছিলাম। দিনে ও রাত্রিতে অন্য কোন সাংসারিক চিন্তা না থাকায় চিত্তকে সারনাথের ও বুদ্ধের মহিমার কথায় সমাহিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। শান্ত ও পুত স্থানে বাস করিলে মন আপনা হইতেই নির্ম্মল হইয়া যায় ও শান্তি পায়।

সেই সময় বিড়লার ধর্ম্মশালায় ঢাকার সুপ্রসিদ্ধা 'আনন্দময়ী মা' অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যোৎস্না প্লাবিত সৌধ

শিরে বসিয়া বুদ্ধের কথা আলোচনা চলিতেছিল। কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মানুষ চায় মুক্তি নিজের কল্যাণে, জন্মমৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যে। সংসার ত্যাগ করিয়া, সমাজ ও দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া নির্জ্জন নিরালায় পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন থাকে, নিজের মুক্তির জন্য। কিন্তু বুদ্ধদেবকে দেখি নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়াও মানবের মঙ্গলের জন্য সমাজে ও দেশের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্ম ও পরম সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন।"

আনন্দময়ী বলিলেন—"না বাবা! ভগবৎ চিন্তা বা মুক্তি লাভ কখন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নহে। মহাত্মা মাত্রেই মুক্তি লাভ করিলে মানব সমাজেরই কল্যাণ, তিনি সাক্ষাতে কিছু করুন আর নাই করুন। বুদ্ধ মানবের পরিত্রাণের জন্য নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাই তিনি অমর, করুণাবতার।"

বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধায় চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল। অদূরে মূল-গন্ধকুটি বিহারে ঘণ্টার গুরু গম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, শুনিতে পাইলাম মহাবোধি সোসাইটীর পালিত অনাথ-বালকদের সহিত হেমলতা দেবী গাহিতেছেন—

জয় জয় মহাবোধি করুণাবতারম্।
জয় নিষ্কলুষ প্রেম সংসার সারম্॥

কুশীনগর

কুশীনগরে বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। গোরক্ষপুর হইতে ত্রিশ মাইল পূর্ব্বে ছোট গণ্ডক নদীর তীরে কুশীনগর অবস্থিত। জেনারেল কানিংহ্যাম সেই প্রাচীন কুশীনগরের স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন এবং অজিতবতী নদীর (প্রাচীন হিরণ্যবতী, বর্ত্তমান ছোট গণ্ডকের) পশ্চিম তীরে শালবৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইবার স্থান নানা প্রমাণ সাহায্যে তিনি নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

কানিংহ্যাম লিখিয়াছেন—"কাশিয়া 'কুশীয়ার' অপভ্রংশ, কুশ তৃণ যে স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মায় সেই ভূখণ্ডের নমে 'কুসীনারা' বা কুশীনগর নামে খ্যাত।" (আর্কিও-লজিক্যাল রিপোর্ট ১৮৬১—৬২, পৃঃ ৮৩) ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থে কুশীনগরের নানা প্রকার বানান দেখা যায়। যেমন—কুশীগ্রাম, কুসীনারা, কুশীনগরী, কুশীনগর ইত্যাদি।

ফা-হিয়ান কপিলবাস্তুর ন্যায় কুশীনগরও জনহীন এবং বিরাট ধ্বংস স্তূপে পরিণত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনাতে বুদ্ধের জন্মস্থানের পাঁচ যোজন পূর্ব্বে—'লোন-মা' অর্থাৎ রামগ্রাম অবস্থিত। হিউয়েন সাংএর মতে কপিলবাস্তু ও রামগ্রামের মধ্যে দূরত্ব ২০০ 'লী'। তিনি

লিখিয়াছেন—বুদ্ধের জন্মস্থান হইতে পাঁচ যোজন পূর্ব্বে গমন করিয়া আমি একটি পল্লী দেখিতে পাই। তাহার নাম 'রামগ্রাম'। এই দেশের বৃদ্ধ রাজা এই স্থানে বুদ্ধাস্থির উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাবংসে লিখিত আছে—"বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইলে, বুদ্ধর অস্থি আট ভাগে বিভক্ত হয় এবং আট জন বিবদমান রাজা এক এক ভাগ লইয়া যান। এই রামগ্রামের রাজা সেই রাজাদের মধ্যে একজন।"

ফা-হিয়ান আরো লিখিয়াছেন—"রামগ্রামের তিন যোজন পূর্ব্বে কুমার সিদ্ধার্থ তাঁহার সারথি ছন্দক ও প্রিয় অশ্বকে দেশ ত্যাগের সময় যে স্থানে পরিত্যাগ করেন সেই স্থানে এক স্তূপ দেখিলাম।"

হিউয়েন সাংএর মতে রামগ্রাম হইতে এই স্থানের দূরত্ব ১০০ লী। দুই জনের মাপ ও বর্ণনাতে মিল আছে। গণ্ডক নদীর অবস্থিতিও সেই স্থান নির্দ্ধারণের প্রধান সহায়। তাহার পর ফা-হিয়ান এই স্থান হইতে চার যোজন পূর্ব্বে যাইয়া বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের স্থানের উপর নির্ম্মিত স্তূপটি দেখিতে পান। এই স্থানকেই তিনি কুশীনগর নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি এখানে একটি সঙ্ঘারামও দেখিতে পান। নগরের উত্তরে হিরণ্যবতী নদী—যে নদী হিউয়েন সাংএর বর্ণনায় অজিতবতী, তাহাই বর্ত্তমানের ছোট গণ্ডক—অবস্থিত বলিয়া গিয়াছেন, তিনি দুইটি শালবৃক্ষর মধ্যে

বিশ্ববরেণ্য বুদ্ধ উত্তর দিকে শির রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিয়া সিংহশয্যায় যে স্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন সেই স্থানের উপর নির্ম্মিত স্তূপটি দর্শন করেন। যে স্থানে বুদ্ধ তাঁহার সর্ব্বশেষ শিষ্য সুভদ্রকে দীক্ষা দিয়াছিলেন; যে স্থানে তাঁহার নশ্বর দেহ সুবর্ণ শবাধারে রাখিয়া সপ্তদিন-ব্যাপী উৎসব চলিয়াছিল; যে স্থানে বজ্রপাণি তাঁহার স্বর্ণ গদা ছুঁড়িয়াছিলেন; যে স্থানে আটজন রাজা বুদ্ধের অস্থি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন সেই সব স্থানের স্তূপ এবং সঙ্ঘা-রামগুলি তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি আরো লিখিয়া-ছেন যে—"সেই সব স্তূপ ও সৌধ এখনও আছে, নগরে অতি অল্প সংখ্যক লোক বাস করে।"

হিউয়েন-সাং লিখিয়াছেন—"রাজকুমার সিদ্ধার্থ যে স্থানে তাঁহার কেশ কর্ত্তন করিয়াছিলেন সেই স্থানের উপর একটি স্তূপ আছে, তাহার দক্ষিণ পূর্ব্বে ১৮০।১৯০ লী বনপথ অতি-ক্রম করিলে ন্যগ্রোধ (বট) বৃক্ষ শ্রেণীর নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থানে ত্রিশ ফুট উচু একটি মনোরম স্তূপ আছে। বুদ্ধের দেহাস্থি পাইবার জন্য তাঁহার ভক্ত আটজন রাজার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়; তখন দ্রোণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ভক্ত আটজন রাজার মধ্যে বুদ্ধাস্থি অষ্ট অংশে ভাগ করিয়া বণ্টন করেন। ব্রাহ্মণ নিজে কেবল চিতাভস্ম নিজ অংশে গ্রহণ করেন। যে স্থানে পবিত্র ভস্ম রাখা হয় তাহার উপর একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা 'অঙ্গার

স্তূপ' নামে খ্যাত। এই স্তূপের উত্তর পূর্ব্বে কুশীনগর অবস্থিত।

হিউয়েন-সাংএর জীবনীতে শ্রাবস্তী নগর হইতে কুশী-নগর ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

চীন পর্য্যটক লিখিয়াছেন—"শ্রাবস্তী নগর হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বে ৮০০ লী গমন করিয়া আমরা কপিলবাস্তু উপস্থিত হই। এই রাজ্যের আয়তন বৃত্তাকারে চারি হাজার লী। রাজধানী ও রাজ্যের প্রায় এক সহস্র গ্রাম জনবিরল এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজ্যের প্রধান নগর বৃত্তাকারে ১৫ লী, সুদৃঢ় প্রাকার বেষ্টিত ও সুরক্ষিত। নগর মধ্যে শুদ্ধোদন রাজার প্রাসাদের অনেক অংশের ধ্বংসাবশেষ ও ভিত এখনও দেখা যায়। তাহার মধ্যে রাজা শুদ্ধোদনের মূর্ত্তি স্থাপিত। ইহার উত্তরে একটি প্রাচীন সৌধের ভিত, ইহার মধ্যে মায়াদেবীর শয়নাগার। তাহারই পার্শ্বে একটি বিহারে গৌতমের শ্বেত হস্তি রূপে মাতৃ গর্ভে প্রবেশের কাহিনীর চিত্র অঙ্কিত। বিহারটির উত্তর পূর্ব্বে ঋষি অসিতের দ্বারা বুদ্ধর জন্ম পত্রিকা প্রনয়ণের স্থান। যে স্থানটি হইতে সিদ্ধার্থ অশ্বারোহণে নগরের বাহিরে গিয়াছিলেন তাহাও চিহ্নিত করিয়া একটি সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে।

কপিলবাস্তু ত্যাগ করিবার পর গভীর বনের মধ্য দিয়া ৫০০ লী গমন করিবার পর আমরা রামগ্রামে উপস্থিত হই। এস্থানে কয়েকটি গৃহ ও অল্প সংখ্যক বাসিন্দা দেখা যায়।

নগরের পশ্চিমে ১০০ ফুট উচ্চ স্তূপ। রামগ্রামের রাজা বুদ্ধাস্থির অংশ আনিয়া এই স্থানে স্থাপন করেন, তাহারই উপর এই স্তূপ নির্ম্মিত।

স্তূপটি হইতে সর্ব্বদা যেন এক জ্যোতিঃ নির্গত হয়। এক গভীর বন দিয়া এই গ্রাম হইতে ১০০লী পূর্ব্বে গমন করিলে আমরা এক বিস্তৃত খোলা স্থানে উপস্থিত হই। এখানেও অশোক নির্ম্মিত এক স্তূপ দেখিতে পাই। বন অতিক্রম করিয়া আমরা কুশীনগর (KU-SHI-NA-KU-LO) রাজ্যে উপস্থিত হই। এই স্থানটি মরুভূমির ন্যায় পড়িয়া আছে। নগরের মধ্যস্থলে চুন্দের বাসস্থানের উপর অশোক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা এখনও আছে। এই স্থানে বুদ্ধের সময় একটি জলধারা নির্গত হয়। এখনও সেই কূপের জল অতি স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট। নগরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে যেখানে আমরা অজিতবতী নদী পার হই তাহার তীরে ও অনতিদূরে এক শালবৃক্ষ কুঞ্জে উপস্থিত হই। এই বৃক্ষগুলি 'হো' (Ho) বৃক্ষেরই মতন। ইহার ছাল কেবল সবুজ কিন্তু পাতা সব সাদা, তবে উজ্জ্বল। সেই স্থানে দুই জোড়া শালবৃক্ষ এখনও দণ্ডায়মান। চারিটি বৃক্ষ মাথায় এক সমান উচু। এই স্থানটিতেই বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সেখানে একটি বিরাট বিহার, তাহারই মধ্যে তথাগতের এক বিরাট মূর্ত্তি স্থাপিত। মস্তক উত্তরদিকে রাখিয়া শয়ন করিয়া আছেন। দেখিলেই মনে হয় যেন

পবিনির্ব্বান স্থানের স্তূপ—কুশীনগর

বুদ্ধের পরিনির্ব্বান অবস্থায় বিরাট মূর্ত্তি—কুশীনগর

ভগবান গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। এই বিহারের উত্তর দিকে রাজা অশোক ২০০ শত ফুট উচু স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখনও তাহা অটুট আছে। তাহারই নিকট একটি শিলা স্তম্ভ। যাহার গাত্রে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ কাহিনী উৎকীর্ণ আছে, কিন্তু কোন তারিখ খোদিত নাই।

তাহার পর আমরা যেখানে নির্ব্বাণের পর তথাগতের শরীর সুবর্ণ শবাধারে রক্ষিত হইয়াছিল যে স্থানে আনন্দকে শেষ বাণী বুদ্ধদেব শুনাইয়াছিলেন, যে স্থানে বুদ্ধের দেহ সুগন্ধ কাষ্ঠের দ্বারা ভষ্মীভূত করা হইয়াছিল, সেই সব স্থানের উপর স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল ; সেইগুলি দেখি।

কানিংহ্যাম সাহেব, ফা-হিয়ান ও হিউয়েন-সাঙএর বর্ণিত ও প্রদত্ত বিবরণ ও মাপের মধ্যে মিল আছে দেখিয়া তিনি কুশীনগর আবিষ্কার ও উদ্ধার করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙএর জীবনীতে লেখা আছে যে, রামগ্রামের ১০০ লী পূর্ব্বে গভীর শালবনের প্রান্তে কুশীনগর অবস্থিত। তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কানিংহ্যাম সাহেব গোরক্ষপুরের ত্রিশ মাইল পূর্ব্বে কাশিয়া তহশীলের মধ্যে কুশীনগরের আবিস্কার ও সংস্কার করেন। পুরাণ ধ্বংশ স্তূপ খনন করিয়া পরিনির্ব্বাণ স্তূপ ও খণ্ডিত অবস্থায় বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ মুর্ত্তি বাহির করেন।

তিনি প্রথম পর্য্যবেক্ষণ সময়ে ১৮৩৮।৩৯ খৃষ্টাব্দে যে সমস্ত স্তূপ, প্রধান প্রধান বিহার ও সৌধাবলী দেখিয়াছিলেন

তাহার পরিচয় দিয়াছেন, যথা—(১) একটী স্তূপ, সমস্ত ইষ্টকদ্বারা গঠিত। যে স্থানে স্তূপটী আছে তাহাই দেবস্থান। (২) 'মাথা-কাউর' এর দুর্গের ধ্বংসাবশেষের উপর জঙ্গলাকীর্ণ ঢিপি এবং তাহার মধ্যে ধ্বংসাবস্থায় একটী স্তূপ। (৩) একটী ১০´ উচু স্তম্ভ ৪´ প্রস্থ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি, (যাহার প্রতিচ্ছবি ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ডে, দ্বিতীয় প্লেটে বুকানান সাহেব মুদ্রিত করিয়াছেন, (৪) অনিরুদ্ধ গ্রামের চতুষ্কোণ ইষ্টকের সৌধের ধ্বংসাবশিষ্ট ঢিবি। (৫) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতক গুলি ঢিবি।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—"হিউয়েন-সাংএর ভারত ভ্রমণ সময়ে কুশীনগর যে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল তাহার ধ্বংসাবস্থায় দেখিয়াছিলাম। নগরটি সেই সময় জনবিরল হইলেও ১২ লী অর্থাৎ দুই মাইল বৃত্তাকারে ছিল। অনেক গুলি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমি বিশ্বাস করি যে অনিরুদ্ধ পল্লীর ধ্বংসাবশিষ্ট স্থানেই সমৃদ্ধিশালী কুশীনগর।" হিউয়েন-সাং আরও লিখিয়াছেন—"এই নগরে তিন লী অর্থাৎ অর্দ্ধ মাইল দূরে অজিতবতী নদীর তীরে শালবৃক্ষ কুঞ্জে বুদ্ধের নির্ব্বাণ স্থান। ইহাই মাথা-কাউরের ধ্বংসাবশিষ্ট। (Ruins of Matha-Kuar-Ka-Kot.) এই স্থানে এক বিরাট ইষ্টকের বিহার এবং তাহার নিকট একটি মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধদেবের বিরাট পরিনির্ব্বাণ মূর্ত্তি হিউয়েন-সাং দেখিয়া গিয়াছেন। এই মন্দিরের সংলগ্নই অশোকের

নির্ম্মিত ২০০ শত ফুট উচু স্তূপ ছিল। সেই স্তূপটির ভিত আমি খনন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছি। হিউয়েন সাং আরও দুইটি ছোট ছোট এবং একটি বড় স্তূপের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রান্তের স্তূপটি বুদ্ধদেবের শেষ দীক্ষিত শিষ্য সুভদ্রের নির্ব্বাণ স্থানের উপর গঠিত। এই সব ঐতিহাসিক স্থান গুলি সঠিক ভাবে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই সব পুণ্য স্থান গুলি 'মাথা-কাউর-কা-কোট' এর ধ্বংস স্থানেয় মধ্যেই ছিল। প্রায় সহস্র বৎসর এই পুণ্যস্থান মাটির ঢিপি ও জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল।" (আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্ট ১৮৬২—৬৩, পৃঃ ৮৩)

'অনিরুদ্ধ গ্রাম'টি যে কুশীনগরের রাজধানী ছিল এই তথ্য প্রমাণে কানিংহ্যাম একটি বিশ্বাসযোগ্য বৌদ্ধ গ্রন্থের কাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন—"বুদ্ধর নির্ব্বাণ লাভের পর সমবেত ভিক্ষু, ভিক্ষুনী ও ভক্তবৃন্দকে অনিরুদ্ধ সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে দেবতাগণকে ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া ক্রন্দন ক্রন্দন করিতে পৃথিবীর দিকে আগমন করিতে দেখিয়াছেন। অনিরুদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের ভ্রাতা অমিতোদনের পুত্র। তিনি বুদ্ধের দশজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর যাবতীয় ইহলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও অনিরুদ্ধের নির্দ্দেশ ও তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইয়াছিল। তাঁহারই নির্দ্দেশে বুদ্ধর প্রিয় ও

অন্তরঙ্গ শিষ্য আনন্দ মল্লরাজগণকে প্রথমে বুদ্ধের পরি-নির্ব্বাণ লাভের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা শোনা মাত্রই মল্লরাজগণ বহুবিধ মাল্য, পুষ্প, বস্ত্র, গীতবাদ্য সহ নির্ব্বাণ লাভের ক্ষেত্রে আগমন করিলেন, ছয় দিন রাজোচিত সমারোহে বুদ্ধর নশ্বর দেহ ঘিরিয়া বহু নর-নারী উৎসব করিয়াছিলেন।

সপ্তম দিবসে মনোনীত আট জন মল্ল রাজকুমার বুদ্ধের প্রাণহীন দেহ সজ্জিত চিতার উপর রাখিবার নিমিত্ত যখন উত্তোলন করিতে যান তখন সেই দেহ এত অধিক ভারী বোধ হয় যে আট জন মল্লবীর সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও সেই শাবাধার তুলিতে সক্ষম হইলেন না। সমবেত নর-নারী এই ঘটনায় অতিশয় বিস্মিত হন এবং ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য অনিরুদ্ধর নিকট গমন করেন। অনিরুদ্ধ যোগবলে জানিলেন বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ বুদ্ধর নশ্বর দেহের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য আসিতেছেন। তাহার আগমন না হইলে তথাগতের দেহ ভস্মীভূত হইবে না। ইহাই দেবতাদের ইচ্ছা। বাস্তবিক কাশ্যপ সেই সময়ে পাবা হইতে কুশীনগরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। মহাকাশ্যপ কুশীনগরের আগমন করিয়াই বুদ্ধের প্রাণহীন দেহ তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তিভবে বুদ্ধের চরণ বন্দনা করিলেন। তৎপর মুহূর্ত্তে চিতা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অনিরুদ্ধই বুদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পৌরোহিত্য

করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধেরই প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য সেই পবিত্র স্থান 'অনিরুদ্ধ গ্রাম' নামে খ্যাত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।" (কানিং আঃ রিঃ ১৮৬২-৬৩, পৃঃ ৮৬)।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ স্থান ও উৎসবের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—"বুদ্ধদেবের যখন অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি কপিলবাস্তু হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে কুশীনগর যাত্রা কালে পাবা গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী আম্র বনে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। চুন্দ নামক জনৈক স্বর্ণকার বৌদ্ধ সমাজকে এই ভূমি দান করিয়াছিলেন। চুন্দ ভিক্ষুকদিগের নিমিত্ত অন্ন ও 'শূকরমর্দ্দব' আহারের জন্য প্রস্তুত করেন। প্রবাদ এই যে সেই 'শূকরমদ্দব' ভোজন করিয়া বুদ্ধ পীড়িত হন। সেই পীড়াতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল। অপরাহ্নে কুশীনগর অভিমুখে কিয়ৎ দূর চলিয়া বুদ্ধদেব শ্রান্তিবোধ করেন। তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং আনন্দকে বলিলেন—'আমার বড় তৃষ্ণা লাগিয়াছে, জল আনিয়া দেও।' আনন্দ জল আনিয়া দিল। অল্প দূরে কুকুষ্ট নদী বহিতেছিল—তীরে পৌঁছাইয়া নদীতে শেষ বারের মতন স্নান করিয়া লইলেন। * * * অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে কুশীনগর-সমীপস্থ হিরণ্যবতী নদীতীরে পৌঁছিয়া গৌতম তথায় কিয়দ্দণ্ড বিশ্রাম করিলেন এবং মল্লদের এক শাল বনে গিয়া বৃক্ষতলে ডান কাতে শয়ান থাকিয়া মৃত্যুর পর আপনার

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে আনন্দের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় আনন্দের বিলাপধ্বনি শুনিয়া তথাগত বলিলেন—'ভাই আনন্দ, আমার জন্য শোক করিও না। আমি ত তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যার জন্ম তারই মৃত্যু—যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়—এমন কি কোন জিনিষ আছে যাহার বিনাশ নাই? শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক এক সময়ে প্রিয়জনদের ছাড়িয়া যাইতেই হইবে।*** আনন্দ, তুমি অতি যত্নে আমার সেবা শুশ্রুষা করিয়াছ—আশীর্ব্বাদ করি তোমার কল্যাণ হউক—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথে চল, বিষয়াশক্তি, অহমিকা, অবিদ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। যতদিন পর্য্যন্ত আমার শিষ্যেরা শুদ্ধাচারী হইয়া সত্যপথে চলিবে, ততদিন আমার ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিবে।" বুদ্ধদেব মল্লদের সেই শাল বনে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—

"পরদিন প্রাতঃকালে তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন বুদ্ধের প্রতি কাহারো কিছু সন্দেহ আছে কিনা? তদুত্তরে আনন্দ কহিলেন—'সত্যের প্রতি, বুদ্ধের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি আমাদের সকলেরই বিশ্বাস অটল, কাহারো মনে তিলমাত্র সংশয় নাই।' পরে বুদ্ধদেব ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন—'যার জন্ম তার ক্ষয় ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—সত্যই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া চিরকাল বাস করিবে। তোমরা যত্নপূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া আপন মুক্তিসাধন করিও।' এই কয়েকটি কথা বলিয়া তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া নির্ব্বাণ

রাজ্যে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হইল—প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিল।* * *

তদনন্তর চক্রবর্ত্তী নৃপতির মরণোত্তর যে অন্ত্যেষ্টি বিধান শাস্ত্র বিহিত, সেই বিধানুসারে বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কুশীনগরের প্রধান প্রধান নাগরিক কর্ত্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহার দেহাবশেষ গ্রহণ করিতে অনেকানেক রাজ্য হইতে ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দগ্ধদেহের অস্থি ও ভস্মরাশি আট ভাগে বিভক্ত হইল। তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়া প্রত্যেকের উপর এক একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। (বৌদ্ধধর্ম্ম, পৃঃ ১০)।

সেই আট পুণ্যস্থান রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবাস্তু, অল্লকপ্প, (আর্দ্র কল্প) রামগ্রাম, বেঠদীপ, (বেষ্ঠদ্বীপ) পাবা, কুশীনগর। এই আট স্থানের স্তূপগুলি ধ্বংস হওয়াতে সম্রাট অশোক তাহাদেরই ভিতের উপর পুনরায় স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কুশীনগরের অশোক নির্ম্মিত স্তূপের ধ্বংসাবশিষ্টের উপরই বর্ত্তমান পরিনিব্বাণ স্তূপটি পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। অশোক নির্ম্মিত সেই স্তূপের ধ্বংস কানিংহ্যাম সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন। বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণ লাভের প্রাক্কালে আনন্দকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে তাঁহার জন্মস্থান 'লুম্বিনী', সাধন লাভের স্থান 'গয়া', ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন স্থান 'সারনাথ', এবং নির্ব্বাণ লাভের স্থান 'কুশীনগর' বৌদ্ধদের

নিকট পরম পুণ্যস্থান বলিয়া চিরকাল শ্রদ্ধা পাইবে। এই চার পুণ্যস্থান দর্শন করিলে পুণ্য হইবে। সম্রাট অশোক এই সব পুণ্যস্থান দর্শন করেন এবং স্তূপ ও স্তম্ভর নির্ম্মাণ দ্বারা পুণ্যস্থান গুলি চিহ্নিত করেন। ফা-হিয়ান, হিউয়েন-সাং এই চারিটি স্থান দর্শন করিয়াছিলেন।

ভগবান বুদ্ধ কুশীনগরের দেহ ত্যাগ করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলে তাঁহার শিষ্যবর্গদের মধ্যে বিশেষ শঙ্কা উপস্থিত হয়। তাহা দূরীকরণের জন্য বুদ্ধ শিষ্যদের বলিয়াছিলেন—"তোমরা ইহাকে সামান্য স্থান মনে করিও না। যেহেতু অতি প্রাচীনকালে এই স্থানেই রাজা সুদর্শনের বহু অট্টালিকাদি পরিশোভিত কুশাবতী নামক রাজধানী ছিল।" এই ভূপ্রোথিত প্রাচীন রাজধানীর বিশদ বর্ণনা 'দীঘনিকয়ের' দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত মহাসুদস্‌সন সুত্তে লিপিবদ্ধ আছে।

বর্ত্তমানে কুশীনগর দেখিলে দর্শকের চিত্তে পুলক সঞ্চার হয়। আড়াই হাজার বৎসরের গৌরবময় দিনের কথা মনে পড়ে। করুণাময় বুদ্ধমূর্ত্তি চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে। স্বাধীন ভারতের ঐশ্বর্য্য অনুমানে প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে। কবির কথায় গাহিতে ইচ্ছা করে।

আমায় ক্ষমোহে ক্ষমো, নমোহে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্য রসে চিত্ত মম
উছল হ'য়ে বাজে॥

আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে॥
—রবীন্দ্রনাথ

বর্ত্তমানে কুশীনগরে যাইবার রেল পথ আউধ ও ত্রিহুত রেলওয়ে (পূর্ব্বের বি, এন, রেলওয়ে) বেনারস হইতে গোরক্ষপুরের ভিতর দিয়া নাওতানা পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহারই উপর তহশীল দেউরিয়া ষ্টেসন। সেখান হইতে ১২ মাইল পূর্ব্ব উত্তরে পাকা রাস্তা কাশিয়া তহশীল পর্য্যন্ত গিয়াছে। ষ্টেসন হইতে মোটর বাস কাশিয়া যাতায়াত করে। সেই বাসে কাশিয়া গিয়া তারপর এক মাইলের উপর পথ একা গাড়ীতে কাশীনগরে আসা যায়। বাস ভাড়া প্রতি জন এক টাকা। কিন্তু ১৯৪৫ সালে যখন কুশীনগর দর্শনে গিয়াছিলাম তখন দেউরিয়া ষ্টেসনে না নামিয়া তাহার অগ্রে গোরক্ষপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলাম। গোরক্ষপুর হইতে পীচ মণ্ডিত সুন্দর রাজপথ পূর্ব্ব দক্ষিণে কাশিয়া গিয়াছে। সেই পথের পার্শ্বেই কুশীনগর, তাহা গোরক্ষপুর হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই রাস্তায় মোটর বাস চলাচল করে, এখানেও ভাড়া প্রতি যাত্রী পিছু এক টাকা। বাস একেবারে কুশীনগর স্তূপের পাশ দিয়া যায়। একটু ঘোরা পথ হইলেও যাইবার

অনেক সুখ ও সুবিধা আছে। গোরক্ষপুর একটি বড় সহর এবং রেলের বৃহৎ জংশন।

কুশীনগরে রাস্তার উপর যেখানে বাস হইতে নামিতে হয় তাহার ডানদিকে পোষ্ট অফিস ও বামদিকে 'বুদ্ধস্কুল' অবস্থিত। স্কুলটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, দ্বিতল সৌধে অবস্থিত। প্রধান শিক্ষক শ্রীদ্বীপ নারায়ণ ত্রিপাঠী এম-এ, বি-টি. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর সহিত যত্ন সহকারে বৌদ্ধধর্ম্ম নীতি ও বুদ্ধের বাণী শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, ছাত্র সংখ্যা প্রায় তিন শত।

এখান হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই সুদৃশ্য 'আর্য্য বিহার' অবস্থিত। দানবীর রাজা বলদেওদাস বিড়লা এই আর্য্য বিহারের সৌধাবলী ১৯৯৫ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বিস্তৃত পুষ্প উদ্যানের মধ্যে এই বিহার অবস্থিত। সৌধের সম্মুখে সোপান বাহিয়া উন্মুক্ত একটি দালানে উপস্থিত হইলে দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ বৃহৎ প্রকোষ্ঠ। একটিতে যাত্রীগণের বিশ্রাম স্থান, অপরটি বাসের জন্য। তারপর মধ্যে এক বড় দালান, ৭০ ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট প্রস্থ। সুন্দর পালিস করা মোজাইক মেঝে। প্রান্ত ভাগে শ্বেত পাথরের বেদীর উপর মনোরম শ্বেত পাথরের বুদ্ধমুর্ত্তি স্থাপিত। এই স্থানেরই উপর অর্দ্ধ গোলাকার স্তূপের আকারে গম্বুজ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার শিরে পাথরের ছত্র। দালানের

দুই পার্শ্বে বাহির দিকে দ্বার বসান ছয়টি করিয়া বারটি কুঠারী, সেইগুলি যাত্রীদের থাকিবার ঘর। এইরূপ ধর্ম্মশালায় থাকিতে পারিলে স্বাস্থ্য যেমন উন্নতি লাভ করে, মনের উৎকর্ষতাও তেমনই বৃদ্ধি পায়।

আর্য্য বিহারের সম্মুখেই একটি উচু পোস্তার উপর একটি ঘর। সেই ঘরটির দ্বার উন্মুক্ত করিবা মাত্রই বক্ষ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সম্মুখেই হরিদ্রবর্ণের রেশমী অঙ্গাবরণ ঢাকা বুদ্ধদেবের বিরাট শায়িত মনোহর প্রস্তরের মূর্ত্তি। দেখিলে সত্যই মনে হয় যেন বুদ্ধদেব গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মূর্ত্তিটী বারো হাত লম্বা এবং দুই হাত উচু চরণদ্বয় পৌণে দুই হাত পরিমাণের। চরণতলে চক্রচিহ্ন উৎকীর্ণ। অঙ্গের গঠন যেমন সুঠাম, চক্ষুর টান তেমনই মনোরম। শ্রদ্ধায় দর্শকের মস্তক নত হয়। পরিনির্ব্বাণ মূর্ত্তির উপরে ঝালর যুক্ত হরিদ্রা বর্ণের রেশমী চন্দ্রাতপ ঝুলান আছে।

এই মন্দিরের ঠিক উত্তরে অশোক নির্ম্মিত পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তি স্থানে নির্ম্মিত স্তূপের ভিতের উপর একটি সুসংস্কৃত অটুট স্তুপ দণ্ডায়মান। তাহার অর্দ্ধ গোলাকার আয়তন প্রাচীন স্তূপের সঠিক পরিকল্পনা, স্তূপের শিরোদেশে চতুষ্কোণ পাদপীঠের উপর তিন থাকে ক্রম স্বল্প পরিসর আকারে ছত্র ত্রয় প্রতিষ্ঠিত। কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ স্থানের উপর এই স্তূপটি ব্রহ্মদেশের বেসিন নগর নিবাসী ইউ পো কিউ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সুসংস্কার ও সুরক্ষিত করিয়া

অশেষ পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। স্তূপের গাত্রে প্রোথিত মর্ম্মর প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ আছে—Repaired and conserved, November 1926 to April 1927, 2470 B. E. by U. Po. Kyw of Bassien. স্তূপটির বাহির গাত্রের উজ্জ্বল সোনালী রং‌এর আবরণ কালের প্রভাবে ম্লান হইয়া যাইতেছে। এই পবিত্র স্থানে দাড়াইলে চিত্তে পরম শান্তি অনুভব করা যায়। বুদ্ধের কথা আপনা হইতে মনে উদয় হয়। স্বাধীন ভারতের গৌরবময় যুগ মানসে ভাসিয়া উঠে।

স্তূপের দক্ষিণ পার্শ্বে বিরাট বিহার বা সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশিষ্ট। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন করিয়া সেই বিহারের ভিত ও স্বরূপ মানব গোচরে রাখিয়াছেন। পরিনির্ব্বাণ স্তূপ ও মূর্ত্তি আর্কিওলজিক্যাল (প্রত্নতত্ত্ব) বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় সুরক্ষিত। কুশীনগরের অনেক পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যর নিদর্শন এখনও মাটী চাপা রহিয়াছে। ভারত সরকার খনন কার্য্য এখন আর করেন না।

প্রধান স্তূপের বাম দিকে 'বিড়লা ভবন' বা 'চারুমণি স্ত্রী স্কুল'। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া অট্টালিকার শিরে খোদিত আছে। ইহার কিঞ্চিৎ উত্তরে বৌদ্ধ ধর্ম্মশালা। তাহার একাংশের একটি ঘরে বুদ্ধদেবের সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্ত্তি সিংহল নিবাসী এম এ পীরীশ মহোদয় প্রদান করিয়াছেন। ধর্ম্মশালার প্রাঙ্গণে একটি

বৃহৎ পিতলের ঘণ্টা বিলম্বিত। এই ঘণ্টা ব্রহ্মদেশবাসীরা প্রদান করিয়াছেন।

ধর্ম্মশালার উত্তর পূর্ব্বে একটি দ্বিতল 'সীমা' অবস্থিত। এই 'সীমা' বা বাউণ্ডারীর নাম 'কুশীনগর সীমা'; ইহা রেঙ্গুনের ৮২ নম্বর পার্ক রোড নিবাসী চাং চীন্ লীয়ন ও তাঁহার পত্নী দান হলা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সীমা চৈত্যে ১৯৩৮ সালের ৪ঠা এপ্রিলে টি, এচ্, এল ম্যাকডনাল্ড কাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত অতি মনোহর এক বুদ্ধ মূৰ্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই মূর্ত্তি এই চৈত্যে নিত্য বৌদ্ধ ভক্তগণ পূজা করিয়া থাকেন। এই সীমার দ্বিতল কক্ষে মুণ্ডিত মস্তক গৌরবর্ণা হরিদ্রা রংএর পরিধানাবৃতা কিশোরী ভিক্ষুণী দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যেমন মনোহর কান্তি তেমনই ভক্তিমাখা নয়ন দ্বয়, হাস্যময়ী মূৰ্ত্তি! ভিক্ষুণী ব্রহ্মদেশ বাসিনী।

এই স্থান হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে যে স্থানে বুদ্ধর নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল সেই স্থান অবস্থিত। সেইস্থানে দুইটী শালবৃক্ষতে মাচার মতন একটি নীড় বাঁধিয়া এক বৌদ্ধ ব্রহ্মদেশবাসী ভিক্ষু বাস করিতে দেখা গেল। সে স্থানের প্রাচীন সৌধাবলী এখনও মৃত্তিকাগর্ভে অবস্থিত।

বর্ত্তমান যুগেও কুশীনগরে ব্রহ্ম, সিংহল, তিব্বত, চীন, জাপান, যাবা, সুমাত্রা, শ্যামবাসী বহু বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রী আগমন করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করেন। তাহাদেরই অর্থে

বৌদ্ধগণ ক্রমশ ক্রমশ নানা প্রতিষ্ঠান ও সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া স্থানটী স্মরণীয় ও গৌরবময় করিয়া ধন্য হইতেছেন।

আজ আড়াই হাজার বৎসর পুর্ব্বে যে মহাপুরুষের সত্য ও শান্তির বাণী শত সহস্র নর-নারীর প্রাণে শান্তিও জীবনে মুক্তি প্রদান করিয়াছিল, যে মহারুষের শিক্ষা-দীক্ষা শত শত রাজন্যবর্গকে সুসাশনে অনুপ্রাণিত করিত, যে মহাপুরুষের জ্ঞান-গরিমা শত শত বৌদ্ধাচার্য্য, ও ভিক্ষুগণকে শত শত সাহিত্য বিজ্ঞান. নীতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে উদ্বুদ্ধ করিত, যে মহামানবের জীবন আদর্শ লইয়া কত শত সহস্র শিল্পী গুহা, বিহার, চৈত্য, স্তূপ, স্তম্ভ নির্ম্মাণের দ্বারা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে, যে মহাপুরুষের কৃপায় সম্রাট অশোক সাম্রাজ্য, মর্য্যাদা, বাহুবল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বুদ্ধের বাণী, নীতি ও জীবন আদর্শ প্রচার উদ্দেশ্যে ৮৪০০০ হাজার স্তূপ ও স্তম্ভ সমগ্র জম্বুদ্বীপে নির্ম্মাণ করিয়া ইতিহাসের পাতায় ও মানবের চিত্তে চীরস্মরণীয় হইয়া আছেন, যে মহাপুরুষের অহিংসা ও শান্তির বাণী বিশ্বে সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার ধ্বজা আড়াই হাজার বৎসর উড্ডীন রখিয়াছে, আজ পৃথিবী ব্যাপী অশান্তি-[illegible]মোদনা হিংসাবৃত্তি পরায়ণ নর-নারীর প্রাণে শান্তি ও মুক্তি[illegible]পথ প্রদর্শন করিত সেই বুদ্ধকে স্মরণ করাই সকলের কার্য্য। আসুন তাঁহার অনুস্মৃতিতে চার পুণ্য-স্থান দর্শন করি।

সমাপ্ত